পাহ্লভী রাজবংশের

উত্থান পতন

জেনারেল হোসাইন ফারদৌস্তের স্মৃতিচারণ

সালাহ্ উদ্দিন শোয়েব চৌধুরী

অনূদিত

পাহ্লভী রাজবংশের উত্থান-পতন

জেনারেল হোসাইন ফারদোস্তের স্মৃতিচারণ

সালাহ্ উদ্দিন শোয়েব চৌধুরী

অনূদিত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পাহ্লভী রাজবংশের উত্থান-পতন

জেনারেল হোসাইন ফারদৌস্তের স্মৃতিচারণ

সালাহ্ উদ্দিন শোয়েব চৌধুরী
অনূদিত

জ্ঞান বিতরণী

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ ● সেপ্টেম্বর— ২০০১

দ্বিতীয় প্রকাশ ● সেপ্টেম্বর— ২০০১

প্রকাশক ● মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম ● জ্ঞান বিতরণী
৩৮/৪ বাংলাবাজার,(মান্নান মার্কেট) ঢাকা-১১০০
অক্ষরবিন্যাস ● অরণি কম্পিউটার,
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড (৩য় তলা) বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মূদ্রণে ● শালুক প্রিন্টার্স ২৬/৪ প্যারিদাস রোড ঢাকা-১১০০
স্বত্ব ● বেগম শাহ্নাজ চৌধুরী (হ্যাপী)
প্রচ্ছদ ● ফরিদী নুমান

মূল্য : ৯০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

উৎসর্গ

এ সময়ের সবচেয়ে সাহসী কবি ও লেখক,
অন্যায়ের কাছে যিনি মাথা নত করেন নি;
যার কাছে নিজ মাতৃভূমি আর
ইসলাম বড় বেশি মূল্যবান
আমার ভাই, আমার বন্ধু,
আমার অনুপ্রেরণার উৎস
কবি আবদুল হাই শিকদারকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

ইরানে শাহ্ রাজ পরিবারের অত্যন্ত কাছের মানুষ জেনারেল হোসাইন ফারদৌস্ত ছিলেন রাজতন্ত্রের স্বার্থ সংরক্ষণকারী বিশ্বস্ত জেনারেল। যার ইরানের রাজনীতি ও সেনা গোয়েন্দা বিভাগের উপর ছিল প্রবল প্রতিপত্তি।

ইরানের ক্রাউন প্রিন্স্ মোহাম্মদ রেজা পাহ্লভীর জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ স্কুলের একজন মনোনীত সহপাঠী হিসেবে ফারদৌস্ত তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুতে পরিণত হন। ক্রাউন প্রিন্সকে যখন সুইজ্যারল্যাণ্ডের 'লা-রোসে" স্কুলে পাঠানো হয় তখন তাঁর সহপাঠী হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে কেবল হোসাইন ফারদৌস্তকেই পাঠানো হয়।

স্কুল জীবন থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত মোহাম্মদ রেজা পাহ্লভীর'র জীবনে হোসাইন ফারদৌস্তের উপস্থিতি এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয় যে অনেক সময়েই একে অন্যের পরিপূরকের দায়িত্বে অবতীর্ণ হতেন।

পাহ্লভী রাজতন্ত্রের পতনের পর হোসাইন ফারদৌস্ত ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৭ সন পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় জুরে শাহ্ পরিবার, তাদের রীতি-নীতি, শাসন ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত জীবন, প্রাপ্তি, ব্যর্থতা ইত্যাদি নিয়ে আত্মজীবনীমূলক যে বইটি লিখেন তারই বাংলা ভাবানুবাদ প্রকাশিত হলো।

শতাব্দির অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইরানের ইসলামী বিপ্লব কেন ভীষণভাবে জরুরী ছিল এর জ্বলন্ত উদাহরণ পাওয়া যাবে এ লেখায়।

লেখক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা ঃ

"পাহ্‌লভী রাজবংশের উত্থান-পতন", জেনারেল হোসাইন ফারদৌস্তের স্মৃতিচারণ মূলক গ্রন্থ। পাহ্‌লভী শাসনকালের অন্যতম ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্ব এবং গোয়েন্দা অফিসার হিসেবে ফারদৌস্ত ছিলেন ইরানের রাজনীতিতে পরিচিত এক নাম। তিনি ক্রাউন প্রিন্সের জন্য সৃষ্ট বিশেষ সামরিক স্কুলের একজন ছাত্র হিসেবে যোগ দেন। রেজা শাহ্ তার পুত্র ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ রেজা পাহ্‌লভীর জন্য এ বিশেষ স্কুল সৃষ্টি করেন। তিনি চেয়েছিলেন ক্রাউন প্রিন্স তার সহপাঠী হিসেবে যাতে মনযোগী এবং কঠোর পরিশ্রমিদেরকেই পান। একারণেই বিশেষ বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোহাম্মদ রেজা পাহ্‌লভীর সহপাঠী নির্বাচন করা হয় যেখানে হোসেইন ফারদৌস্তকেও নির্বাচিত করা হয়। বাল্যকাল থেকেই ফারদৌস্ত,মোহাম্মদ রেজা পাহ্‌লভীর খুব বিশ্বস্ত এবং ঘনিষ্ঠতম বন্ধুত্বে পরিণত হন। ক্রাউন প্রিন্সকে যখন সুইজ্যারল্যান্ডের বিখ্যাত শিক্ষায়তন "লে-রোসে" তে পাঠানো হয় তখন তার সহপাঠীদের মধ্য থেকে একমাত্র হোসেইন ফারদৌস্তকেই তার স্যাথে রাষ্ট্রীয়ভাবে লে-রোসেতে পাঠানো হয়। সুইজ্যারল্যান্ডে ফারদৌস্ত-ক্রাউন প্রিন্সের বন্ধুত্ব আরো ঘনিষ্ঠতা পায়। বন্ধুত্ব এমন এক পর্যায়ে পৌছে যে দু'বন্ধু একে অন্যের পরিপূরকে পরিণত হন। মোহাম্মদ রেজা পাহ্‌লভী ক্ষমতায় আরোহণ করার পর ফারদৌস্তকেও গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং তাদের বন্ধুত্ব এতো ঘনিষ্ঠ ছিল যে মোহাম্মদ রেজা তার *"এ মিশন ফর মাই কান্ট্রি"* গ্রন্থে হোসেইন ফারদৌস্তকে "আমার বন্ধু" হিসেবে সম্বোধিত করেন।

মোহাম্মদ রেজা'র শাসনকালে হোসেইন ফারদৌস্তই ছিলেন একমাত্র কর্মকর্তা যিনি শাহ্ ও রাণীর সাথে একসাথে বসে খাবার খেতেন। তিনি শাহ্‌র "চোখ" এবং "কান" হিসেবে ইরানের গোয়েন্দা দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ফারদৌস্ত ইরানের শাহের সাথে বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর যোগাযোগ রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখতেন। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ তাদের "এলিটস্ এণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ পাওয়ার ইন ইরান" (Elites and Distribution of power in Iran) নামক গোপন গ্রন্থে (প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬) জেনারেল হোসেইন ফারদোস্ত সম্পর্কে বলে, "শাহ্ সামরিক ও নিরাপত্তা কর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখেন তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ফারদৌস্তের মাধ্যমে। তিনি শাহ্'র জন্য স্থাপিত বিশেষ স্কুল এবং পরবর্তীতে সুইজ্যারল্যান্ডের লে-রোসে স্কুলের সহপাঠী। ফারদৌস্ত সবসময় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আসছেন। ১৯৪১-এর দিকে মোহাম্মদ রেজা তাকে জার্মান দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেন। ফারদৌস্ত, শাহ্'র বিশেষ গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান এবং পরবর্তীতে সাভাক (**SAVAK**)-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি রাজকীয় পরিদর্শন দপ্তরের প্রধান হয়ে শাহ্'র প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের দিকে চোখ রাখছেন। মোহাম্মদ হোসেন ফারদৌস্ত একজন বিচক্ষণ ও কর্মতৎপর ব্যক্তি। অর্থনৈতিকভাবেও তিনি খুবই স্বচ্ছল।"

জেনারেল হোসেইন ফারদৌস্ত তার জীবদ্দশায় প্রায় পনেরোশ পৃষ্ঠার যে আত্মজীবনী লিখে যান তারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হলো এ বইটি। ইরানের ক্ষমতাসীন সরকার এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণিক দলিল বিবেচনা করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় এর হাজার হাজার

www.pathagar.com

কপি প্রকাশ করে। বিশ্বব্যপী দারুণভাবে সমাদৃত হওয়ায় মাত্র দু'বছরে এ বইয়ের ত্রিশ হাজারেরও বেশি কপি বিক্রি হয়ে যায়। এ বইটি ইরানের "ইন্সটিটিউট ফর পলিটিক্যাল স্টাডিজ এণ্ড রিসার্চ" কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদিস পাবলিশিং হাউজ কর্তৃক পরিবেশিত।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব সম্পর্কে আমাদের দেশের মানুষের তেমন কোন ধারণা নেই। কোন্ কারণে এবং কেন ইরানে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয় সে বিষয়ে অনেক গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে, তবে জেনারেল হোসেইন ফারদৌস্ত, শাহ্ রাজবংশের খুবই কাছের মানুষ হিসেবে খুব সুন্দরভাবে এবং সহজ ভাষায় ইরানের রাজ-শাসকদের কু-কর্মের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। বইটি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হলেও বাংলায় অনুবাদের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

বইটি বাংলা অনুবাদে হাত দেই ১৯৯৭ সনে। কিন্তু ব্যক্তিগত ঝামেলার কারণে বার বারই কাজে বিঘ্ন ঘটে। মূল বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো বাংলায় রূপান্তরের পর বেশ কয়েকবার সম্পাদনা করার পরও হয়তো কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। তবে যারা ইরানের ইসলামী বিপ্লব সম্পর্কে জানার আগ্রহ রাখেন তাঁদের জন্য এ বইটি নিঃসন্দেহে খুবই সহায়ক।

ব্যক্তিগত বিলাস-বৈভবে ইরানের পাহ্লভী রাজবংশ কি উন্মত্তভাবে মগ্ন ছিল; সীমাহীন অপচয়, বাঁধহীন যৌনাচার এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহারের মাধ্যমে পাহ্লভী রাজবংশের সদস্যরা ইরানের সম্পদ কি নির্মমভাবে নষ্ট করে নিজেদের বৈভব বাড়িয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফারদৌস্তের বইয়ে। আজ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে, অর্থনীতিতে, সামরিক শক্তিতে ইরান যে ব্যাপক সমৃদ্ধি ও সাফল্য অর্জন করেছে তার ভিত রচনা হয় ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বাধীন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। সম্ভবত ইরানে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে যদি বিপ্লব সাধিত না হতো তাহলে পাহ্লভী রাজবংশের যথেচ্ছাচারে জর্জড়িত ইরান বিদেশমূখী দূর্বল এক রাষ্ট্রে পরিণত হত। ইরানের কোষাগার থেকে পাহ্লভীরা হয়তো আরো বহু বিলিয়ন ডলার লুটে নিয়ে যেত। শাহ্ প্রশাসনের পশ্চিমা ঘেষা নীতির ফলে মুসলিম অধ্যুষিত ইরানে ইসলাম আজ হুমকির সম্মুখিন হতো। পাহ্লভী রাজবংশের অত্যাচারে ইরানী জনগণের নাভিশ্বাস উঠতো। কিন্তু ইসলামী বিপ্লব ইরানের জনগণকে স্বৈরাচারী এক ডায়নোসরের কবল থেকে উদ্ধার করেছে।

জেনারেল হোসেইন ফারদৌস্তের এ গ্রন্থে ইরানের বিগত পাহ্লভী শাসকের ব্যক্তিগত দুশ্চরিত্রই নয় বরং তার (মোহাম্মদ রেজা পাহ্লভী) বোন আশরাফগণদের যথেচ্ছাচার এবং যৌনাচারের বিষয়ও প্রকাশিত হয়েছে। শাহ্'র বোন আশরাফের সাথে অনেক পুরুষেরই অবৈধ সম্পর্ক ছিল। এমনকি পাকিস্তানের জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথেও তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল।

ফারদৌস্তের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় শাহ্ তার সীমাহীন যৌনাচারে ইরানের রাজ কোষাগার থেকে প্রতিবছর কত কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে কোটি কোটি টাকা অপচয় করেছেন। ইরানের জনগণের স্বার্থেই সেখানে ইসলামী বিপ্লবের কোন বিকল্প ছিলনা। ইমাম আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানে যে সকল ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয় তা বাকী বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

www.pathagar.com

১৯১৭ সালে তেহরানে আমার জন্ম। আমার পিতা সাইফুল্লাহ্ একজন ক্যাপ্টেন হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ পূর্ববর্তী তাঁর সর্বশেষ পোষ্টিং ছিল বন্দর আব্বাসের অস্ত্রাগারের নিরাপত্তা ইউনিটে। বাল্যকাল থেকেই আমার পিতা আমাকে সেনাবাহিনীতে যোগদানের ব্যাপারে উৎসাহ যোগাতেন এবং অবশেষে ১৯২৩ সনে মাত্র ছয় বছর বয়সে আমি মিলিটারী স্কুলে যোগদান করি।

দরিদ্র পরিবারে আমার জন্ম। তাই আমার পিতা বাড়তি বোনাসের আশায় তেহরানের বাইরে দূর্গম আবহাওয়ায় কাজ করতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। পরিবারের সদস্য আমার দাদী, পিতা, মা আর পাঁচ ভাই-বোন। যে ছয় বছর আমি মিলিটারী স্কুলে ছিলাম তার পুরোসময় জুড়ে আমার পিতা কিরমান এবং বন্দর আব্বাসে কর্মরত ছিলেন। ১৯৩১ সালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রতি মাসে ৪৭ টোমান্স আয় করতেন এবং ৩০ টোমান্স সংসারের খরচ নির্বাহের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। এ অর্থ দিয়েই আমাদেরকে চলতে হতো। পরবর্তীতে আমরা একটি বাড়ি কিনতে সমর্থ হই এবং মধ্যবিত্তের জীবন যাপন করতে থাকি। পরবর্তীতে আমি ক্রাউন প্রিন্সের বিশেষ ক্লাসে ভর্তি হই। আমিই ছিলাম একমাত্র ছাত্র যার পিতা একজন ৩য় লেফটেন্যান্ট। অথচ ঐ শ্রেণীতে অধ্যায়নরত সর্বনিম্ন সামাজিক অবস্থান সম্পন্ন ছাত্রটির পিতা একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। অবশ্য সে সময়ে জেনারেলদের সংখ্যা খুবই কম ছিল, যা সম্ভবত একজনের হাতের আঙ্গুলের সংখ্যার চেয়ে বেশি নয়। অনেক ছাত্রের পিতা ছিলেন মন্ত্রী।

স্কুলেই মধ্যাহ্নভোজের সময়ে ছাত্ররা তাদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে নিয়ে আসা খাবার খেত। আমার মা একটি ধাতব পাত্রে সুন্দরভাবে কিছু ভাত দিতেন। আমি সেই পাত্র হাতে পায়ে হেটে স্কুলে যেতাম। অথচ অন্য ছাত্ররা আসতো কোচে করে সাথে থাকতো ভৃত্য। মধ্যাহ্নভোজের সময় ভৃত্যরা কয়েকটি পাত্রে ওদের একেকজনের খাবার পরিবেশন করতো। যেসব সহকারী সেখানে কাজ করতেন তারা প্রায়শই আমার খাবারের প্রতি ইঙ্গিত করে মশকরা করতেন। তাদের কারণেই আমি বাড়তি খাবার আনতে বাধ্য হই, কারণ ছাত্রদের বেঁচে যাওয়া খাবার ওরা পেতেন।

প্রতিদিনই কিছু খাবার আমি বাঁচাতাম যদিও নিজে অর্ধভূক্ত থাকতাম। আর এসব সমস্যার ফলে আমার মধ্যে একধরনের নম্র মানসিকতার জন্ম হয় যা আমাকে চরমভাবে ভদ্র ও নমনীয় করে তোলে। আর সম্ভবত এ জন্যেই রেজা খান ও ক্রাউন প্রিন্সের দৃষ্টি পড়ে আমার উপর।

www.pathagar.com

মিলিটারী স্কুলে যোগ দেয়ার দুই অথবা তিন মাস পর, একদিন সেনাবাহিনীর প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার প্রধান, জেনারেল আমির মুসাওয়াক্ নাখ্জাভান আমাদের স্কুল পরিদর্শনে আসেন। তখন তাঁর আগমনের হেতু যদিও গোপন ছিল কিন্তু পরবর্তীতে আমি জানতে পারি রেজা শাহ্ তাঁকে ক্রাউন প্রিন্সের জন্যে একটি বিশেষ ক্লাস তৈরির নির্দেশ দেন। এ ক্লাসে ক্রাউন প্রিন্স ছাড়া আরো কুড়িজন ছাত্র অংশ নেবে। তাই ঐ বিশেষ ক্লাসের জন্য শিক্ষার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল নাখ্জাভান আমাদের স্কুল পরিদর্শনে আসেন। তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভ্রান্ত বংশের দু'জন ছাত্রকে বাছাই করা হয়। এখনো আমার ভালভাবেই স্মরণে আছে যে তাদের একজন ছিল অভিজাত বখ্তিয়ারী বংশের আর অপরজন জেনারেলের পুত্র। আমরা সারিবদ্ধভাবে দাড়ানো ছিলাম আর জেনারেল নাখ্জাভান তাঁর হাতের ছড়ির ইশারায় এদেরকে সারির বাইরে আসতে নির্দেশ দিলেন। এরপর তৃতীয় ছাত্র নির্বাচনের পালা। সেনা স্কুলের প্রধান, যিনি পেশায় একজন ক্যাপ্টেন তিনি জেনারেল নাখ্জাভানের কানের কাছে ফিস্ফিসিয়ে কি যেন বল্লেন; আর তাৎক্ষণিকভাবে জেনারেল তাঁর ছড়ি আমার কাঁধে ছোঁয়ালেন। আমি সাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালাম। পরবর্তী সকালে আমাদের তিনজনকে ক্রাউন প্রিন্সের বিশেষ ক্লাসে পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে জেনারেল প্রস্থান করলেন।

ক্রাউন প্রিন্সের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ ঃ

মিলিটারী একাডেমীর একটি পৃথক ভবনে ক্রাউন প্রিন্সের বিশেষ ক্লাস। এখনকার মত তখন বড় দালান ছিলনা। তাই ছোট্ট একটি দালানকে বিশেষ ক্লাসের স্থান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। সকালে যথারীতি আমরা স্কুলে পৌঁছলে স্কুল প্রধান আমাদের তিনজনকে বিশেষ ক্লাসে নিয়ে যান। যখন আমরা ক্লাস-করিডোরে পৌছলাম ততক্ষণে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। আমি করিডোরেই অপেক্ষামান রইলাম এবং আমাদের স্কুল প্রধান আমাদেরকে বিশেষ ক্লাসের অধ্যক্ষ কর্ণেল মোহম্মদ বাঘের খাঁনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বেল বাঁজার পর প্রথমেই ক্রাউন প্রিন্স ক্লাসের বাইরে এলেন এবং তাঁর কোমড়ের বেল্টের বকলেসে সগর্ভে নাড়া দিয়ে বোঝাতে চাইলেন যে তিনিই ক্রাউন প্রিন্স। আমরা তিনজনই একটা কোণে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের বয়স ৬ থেকে ৮ বছরের মধ্যে। ক্রাউন প্রিন্স আমার চেয়ে দু বছরের ছোট (তাঁর জন্ম ১৯১৯ এ)। তিনি আমাদের কাছে এলেন, পর্যবেক্ষণ করলেন এবং আমার অপর দুই সঙ্গীকে তাঁর পছন্দ হলো না। অবশেষে তিনি আমার কাছে এলেন এবং আমার মুখমন্ডলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। অতঃপর আমার সাথে বন্ধুসুলভ বাক্য বিনিময় শুরু করলেন। তিনি আমার বাবার নাম ও পেশা

www.pathagar.com

সম্পর্কে জানতে চাইলেন। অন্য দুই ছাত্র আমার দিকে হিংসাভরা চোখে তাকিয়ে রইল। আবারও ঘন্টা বেঁজে উঠলো এবং আমরা ক্লাসে যোগ দিলাম। শিক্ষক পড়া বোঝাচ্ছিলেন কিন্তু ক্রাউন প্রিন্স কয়েকবার পেছনে ফিরে আমাকে দেখলেন। কিছুদিন পর তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আমার বন্ধু হতে চাও"? আমি জবাবে বললাম হ্যাঁ আমি আপনার বন্ধু হতে পারলে খুবই আনন্দিত হব"। যদিও এ বন্ধুত্বের ফলে আমাদের সম্পর্কের তেমন পরিবর্তন হয়নি। তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসতে অথবা তাঁর বাসভবনে যেতে বলতেন না। কিন্তু তিনি অবসরে অন্য সবার চেয়ে আমার সাথে অধিক সময় কথা বলতেন।

পরীক্ষাসমূহে আমি সবচেয়ে ভাল নম্বর প্রাপ্ত হই। দ্বিতীয় বছরে বিশেষ ক্লাস গুলিস্তান প্রাসাদে স্থানান্তরিত হয়। শ্রেণীকক্ষের জন্য নির্ধারিত ভবনের নাম "খাবগাহ্" যা নাসের আল-দ্বীনের সময়ে তৈরি। ভবন ও এর এলাকা যথেষ্ট বিস্তৃত যা একটি দেয়ালের মাধ্যমে মূল প্রাসাদ থেকে বিভক্ত। "খাবগাহ্' এর ভূগর্ভস্থ কুঠুরিতে অসংখ্য বাক্সে রাজকীয় মনি-মুক্তা সংরক্ষিত ছিল। পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল যে বিশেষ ক্লাস গুলিস্তান প্রাসাদে স্থানান্তরের নির্দেশ শাহ্ এজন্যেই দেন যাতে ক্রাউন প্রিন্স তাঁর বাসভবনের নিকটবর্তী অবস্থানে থাকেন।

একদিন আমরা যখন আমাদের অধ্যায়নে ব্যস্ত তখন রেজা শাহ্ প্রবেশ করলেন। স্কুলের অধ্যক্ষ কর্ণেল বাঘের খাঁন আমার দিকে আঙ্গুল দেখালেন। শাহ্ আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ভয়ে আমার শিশু মন কেঁপে উঠলো— আমার সারা শরীর ভয়ে জড়ো হয়ে এলো। মনে মনে ভাবলাম, যদি তিনি আমার সামনে থেকে প্রস্থান করতেন। কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে থেকে বল্লেন, "এখন থেকে ক্লাস শেষে তুমি ক্রাউন প্রিন্সের প্রাসাদে আসবে এবং ক্রাউন প্রিন্স শয্যায় যাওয়ার পূর্বপর্যন্ত তাঁর সাথেই পড়াশোনা করবে। এটাই তোমার নিত্য কর্মসূচী এবং শুক্রবার অথবা ছুটির দিনগুলোতেও তুমি ক্রাউন প্রিন্সের সাথে থাকবে"। আমি ধরে নিলাম যে, শ্রেণীতে আমার ভাল ফলাফল লাভের কারণেই এ ব্যবস্থা। আর বিষয়টা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো যখন আমি ক্রাউন প্রিন্সের বাসভবনে গেলাম এবং পরবর্তী দিন থেকে ক্লাসে তাঁর পাশেই বসতে শুরু করলাম।

আরফা নামের একজন ফরাসী ভৃত্যা যিনি তেহরানের আরফাদোলেহ্ পরিবারের এক সদস্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তিনি ক্রাউন প্রিন্সের পরিচর্যা করতেন। যদিও তার বিয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি স্বামী হারান কিন্তু তবুও তাকে তার স্বামীর পারিবারিক উপাধিতেই সম্মোধন করা হতো। মিসেস আরফা ক্রাউন প্রিন্সের অভিষেক

www.pathagar.com

থেকে শুরু করে সুইজ্যারল্যান্ড গমনকাল অবধি তাঁর দেখাশোনা করতেন। অভিষেকের পরবর্তী মুহূর্ত থেকে ক্রাউন প্রিন্সকে তাঁর মা ও বোনদের থেকে আলাদা করে একটা স্বতন্ত্র বাসভবনে রাখা হয়। ক্রাউন প্রিন্সের দৈনন্দিন প্রতিটি বিষয় মিসেস আরফা'র সিদ্ধান্তে গৃহিত হত। তিনি তাঁর লেখাপড়া, খাবার, বিশ্রাম, শরীর চর্চাসহ সব বিষয়েই এককভাবে দেখাশোনা করতেন। মিসেস আরফা'র অনুমতি ছাড়া কেউই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সাহস পেতেন না। মিসেস আরফা'র সাথে রেজা খান সপ্তাহে দু'বার দেখা করতেন এবং মোহাম্মদ রেজার খোঁজ খবর নিতেন। মিসেস আরফা রেজা শাহের সাথে যখনতখন দেখা করতে পারতেন। আর তিনিই ছিলেন একমাত্র মানুষ যাকে রেজা শাহ্ পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন। মিসেস আরফা ক্রাউন প্রিন্সকে ফরাসী ভাষা শেখাতেন, আর প্রাসাদে অবস্থানের বদৌলতে আমিও সেসব ক্লাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতাম। যখন আমাদেরকে সুইজ্যারল্যান্ড পাঠানো হলো তখন ক্রাউন প্রিন্স ফরাসী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন এবং আমারও ফরাসী'র মান খারাপ ছিলনা। ১৯৩১ সনে সুইজ্যারল্যান্ড যাওয়ার ছয় বছর পূর্ব থেকে মিসেস আরফাই ছিলেন ক্রাউন প্রিন্সের প্রাসাদের একক কর্তৃত্বের অধিকারী। ক্রাউন প্রিন্সের উপর তাঁর সার্বক্ষণিক এবং সরাসরি নজর থাকতো।

যখন মোহাম্মদ রেজা সুইজ্যারল্যান্ড চলে গেলেন তখন মিসেস আরফাও তাঁর উপার্জিত সম্পদ নিয়ে একমাত্র কন্যা ফিরোজাহ্ সহ ফ্রান্সে ফিরে গেলেন এবং সে অর্থ দিয়ে রাজসিক একটি বাড়ি ও দু'দুটো হোটেল ক্রয় করলেন। মিসেস আরফা'র কন্যা ফিরোজাহ্ হোটেলগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন। এরপর যখনই আমি প্যারিস গেছি তখনই মিসেস আরফা ও তাঁর কন্যার সাথে দেখা করেছি এবং আতিথ্য গ্রহণ করেছি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আরফাদোলেহ্ পরিবার সম্পূর্ণভাবে একটি পশ্চিমা ঘেষা পরিবার।

১৯৩১ সালে ক্রাউন প্রিন্সের সঙ্গী হয়ে আমি সুইজ্যারল্যান্ডে গেলাম। উদ্দেশ্য, পড়াশোনা অব্যাহত রাখা। যখন সুইজ্যারল্যান্ড যাই তখন আমার বয়স ১৩—১৪ বছর এবং আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন আমাদেরকে এত অল্প বয়সেই সুইজ্যারল্যান্ড পাঠানো হচ্ছে, আর পড়াশোনার জন্য এ দেশটিকেই বা বেছে নেয়া হলো কেন। সুইজ্যারল্যান্ডে যাওয়ার ব্যাপারে যদিও আমি আগে থেকেই জানতে পেরেছিলাম কিন্তু ক্রাউন প্রিন্স কখনোই এ ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলেননি। আমি আজও জানিনা যে তিনি কি ব্যাপারটা জানতেন কিনা অথবা আমার কাছে এ বিষয়টি গোপন করেছিলেন কিনা।

একদিন আমরা দু'জন একটা কক্ষে খেলাধূলায় মত্ত ছিলাম, তখন রেজা শাহ্ প্রবেশ

www.pathagar.com

করে বল্লেন, "তুমি ক্রাউন প্রিন্সের সঙ্গী হয়ে সুইজ্যারল্যান্ড যাচ্ছ"। আমি শুনে যদিও দুঃখিত হলাম তবুও আমার মনের ভাব তাঁর কাছে প্রকাশ করতে পারলাম না। ভয় কাতরচিত্তে জবাব দিলাম "জ্বি-জনাব"।

যখন তিনি চলে গেলেন তখন আমি ক্রাউন প্রিন্সকে বল্লাম, আমার পরিবার-পরিজনকে ছেড়ে ভিনদেশে যাওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না। আমি সুইজ্যারল্যান্ড যাওয়ার ব্যাপারে নিজের অপারগতা প্রকাশ করলাম। কিন্তু অনঢ় ক্রাউন প্রিন্স এ ব্যাপারে কোন মন্তব্যই প্রকাশ করলেন না। শুধু বল্লেন রেজা শাহের হুকুম অমান্য করলে আমাকে সমস্যার সম্মুখিন হতে হবে। ক্রাউন প্রিন্স এ বিষয়টা রেজা শাহের গোচরে আনলেন— সম্পূর্ণভাবে আমার অজ্ঞাতে। পরবর্তী দিন রেজা শাহ্ আবার এলেন এবং সরাসরি আমাকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কেন সুইজ্যারল্যান্ড যেতে চাইছ না"। আমি বল্লাম আমার পরিবার-পরিজনকে ত্যাগ করে অন্য দেশে যেতে আমার মন মানেনা। তিনি রুঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "আমি কে তুমি কি জান?" জবাবে আমি বল্লাম আপনি মহামান্য রাজা।

তখন তিনি বল্লেন, "তাহলে তুমি জান যে আমি যা চাই তাই করতে পারি। ঠিক আছে প্রতি ছয় মাসে একবার তোমার পরিবার-পরিজনকে তোমার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য সুইজ্যাল্যান্ডে পাঠানো হবে"। আমি মেনে নিলাম।

আমার সমস্যা হলো, আমার পিতার কর্মস্থল ছিল তেহরান থেকে অনেক দূরে। তাই আমাদের পরিবারকে দেখা-শোনা করার মতো কোন লোক ছিলনা। আমি এ বিষয়ে ক্রাউন প্রিন্সকে অবগত করলে তিনি রেজা শাহের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেন। রেজা শাহ্ ক্রাউন প্রিন্সকে বল্লেন, "যাও জেনারেল জারঘানকে বলো হোসাইন ফারদোস্তের পিতাকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তেহরানে বদলী করে আনতে। প্রকৃতপক্ষে ৪৮ ঘন্টার আগেই আমার পিতাকে তেহরানে বদলী করে কমান্ডার পদে নিয়োগ দেয়া হলো। আমার সমস্যা সমাধা হওয়ার পরপরই রেজা শাহ্, ক্রাউন প্রিন্স এবং তাঁদের সামরিক-বেসামরিক বিশাল বহরসহ তেহরান থেকে বন্দর আন্জালী'র প্রতি রওয়ানা হলেন। ক্রাউন প্রিন্সের মাতা, বোনেরা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও বন্দর আন্জালীতে গেলেন। আমার সাথে গেলেন আমার পিতা ও মাতা। আঞ্জালীতে দু'দিন অবস্থানের পর আমাদের বিদায়ের মূহুর্ত এলো। পাশ্চাত্য পোশাক পড়ে আমি ও ক্রাউন প্রিন্স রুশ জাহাজে উঠলাম। এর আগে আমাদের পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। প্রায় ১০০ লোকের মাঝখানে রেজা শাহ্ নিজে দাঁড়িয়ে রইলেন আমাদেরকে বিদায় জানানোর জন্য। রুশ জাহাজে

www.pathagar.com

ছিলেন দু'জন জেনারেল আর শতাধিক সৈন্য। এরা বিশেষ ধরনের পোশাক পড়েছিলেন। পরে জানতে পেরেছিলাম এরা ষ্ট্যালিনের বিশেষ বাহিনীর সদস্য।

পরবর্তী দিন বাকুতে পৌছে আমরা কনস্যুলেট জেনারেলের বাসভবনের দিকে রওয়ানা হলাম। ক্রাউন প্রিন্সকে দেখার জন্য অসংখ্য ইরানী বনিক কনস্যুলেট জেনারেলের বাসভবনে আসেন। অপরাহ্নে আমাদেরকে জানানো হলো, ট্রেন তৈরি। আমরা ট্রেনে চড়ে বসলাম। আমি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম ষ্ট্যালিনের বিশেষ বাহিনীর একই সদস্য যারা জাহাজে ছিলেন তারাই ট্রেনেও আমাদের সহযাত্রী হলেন।

বাকু থেকে পোল্যান্ড সীমান্তে পৌছতে তিন-দিন তিন-রাত সময় লাগলেও ট্রেন বিরামহীন ভাবেই চলতে থাকলো। যাত্রাপথে শুধু একস্থানে তেল ভরার জন্য থামলো। দ্বিতীয়বার থামলো খারকোভে। আমরা পোল্যান্ড সীমান্তে পৌছে গেছি এবং এখন ট্রেন বদলের পালা। কারণ রুশ ও পোলিশ ট্রেনের ট্র্যাক অভিন্ন নয়। ওয়ারশো রেল ষ্টেশনে ইরানী রাষ্ট্রদূত আসাদ বাহাদুর ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ক্রাউন প্রিন্সের সাথে দেখা করতে এলেন। অল্পসময় যাত্রা বিরতির পর ট্রেন জার্মানী অভিমুখে এবং সবশেষে সুইজ্যারল্যান্ডের পথে যাত্রা করলো।

লা-রোসে স্কুলেই আমাদের অধ্যায়নের কথা কিন্তু নাম তালিকাভূক্তকরণ ও ভর্তি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন না হওয়ায় অস্থায়ীভাবে লাউস্যানে'র একটা সাধারণ স্কুলে ভর্তি হলাম। এ স্কুলেই শিক্ষা বর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমরা অধ্যায়ন চালিয়ে গেলাম। এ স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ছিল নিম্ন পরিবারের সদস্য তাই তাদের আচার-আচরণও ছিল অশোভন এবং অমার্জিত।

সুইজ্যারল্যান্ডে আমাদের অবস্থানের দ্বিতীয় বৎসর ক্রাউন প্রিন্স, তাঁর ভাই আলী রেজা, আমি ও মেহ্রপর তেইমরতাম লা রোসে আবাসিক স্কুলে স্থানান্তরিত হলাম। লা-রোসে স্কুলটি রোলে নামক একটি ছোট্ট শহরে অবস্থিত। এখানকার পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অধিকাংশ শিক্ষার্থীই বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে। তিন'শ শিক্ষার্থীর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন কেবল সুইস। এর কারণ, এ স্কুলের বেতন ইত্যাদি খুবই বেশি যা কেবল বিত্তবানদের পক্ষেই বহন করা সম্ভব ছিল।

লা-রোসেতে প্রতি ২-৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি কক্ষ ছিল। কিন্তু ক্রাউন প্রিন্সের জন্যই একটি স্বতন্ত্র কক্ষ ছিল। লা রোসেতে আর্নেষ্ট পেরন নামে এক ভৃত্য ছিল যে প্রকৃতপক্ষে ছিল একজন সু-শিক্ষিত চৌকষ যুবক। লা রোসেতে আমরা আসার মাত্র কয়েকদিন পূর্বেই পেরন সেখানে চাকরি নেয়। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না কেন

www.pathagar.com

পেরনের মতো একজন শিক্ষিত যুবক গৃহ ভৃত্যের চাকরি নিল। সবচেয়ে বড় কথা হলো পেরনের অসম্ভব জ্ঞান প্রাচুর্য্য, চমৎকার ব্যক্তিত্ব তাকে ক্রাউন প্রিন্সের অত্যন্ত প্রিয় পাত্রে পরিণত করে। পেরন সম্পর্কে আমার জিজ্ঞাসার কোন কিনারা আমি খুঁজে পাইনি। পরে অবশ্য উপলব্ধি করতে পারি যে, সে ছিল পশ্চিমাদের এজেন্ট যার কাজ ছিল ক্রাউন প্রিন্সের হৃদয়ে বিশেষ স্থান দখল করা যাতে পরবর্তীতে সে ইরানের প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রভাব খাঁটাতে পারে।

লা-রোসেতে হাইস্কুল সমাপ্তির পর আমাদেরকে তেহরানে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ পাঠান রেজা শাহ্। আমরা তেহরানে ফিরে এলাম।

সুইজ্যারল্যান্ডে হাইস্কুল শিক্ষালাভের পর আমার ইচ্ছা ছিল মেডিসিন (চিকিৎসা শাস্ত্রে) শিক্ষা লাভের। কিন্তু রেজা শাহের ইচ্ছায় আমি মিলিটারী একাডেমীতে ফিরে গেলাম। মিলিটারী একাডেমীতে একটি বিশেষ প্লাটুন থেকে বাছাই করা শিক্ষার্থী ও অফিসারের সমন্বয়ে একটি বিশেষ কোম্পানী ক্রাউন প্রিন্সের জন্য তৈরি করা হলো। এটির কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন মাহ্মুদ আমিনি। ক্যাপ্টেন মাহ্মুদ ছিলেন একজন তেজস্বী সৈনিক এবং সুদক্ষ প্রশিক্ষক। সে সময়ে মিলিটারী একাডেমীর অধ্যায়নকাল ছিল দুই বছর। এ পুরোসময়ে আমাদের কমান্ডার পরিবর্তন করা হয়নি। ক্রাউন প্রিন্স ও আমি সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে গ্রাজুয়েশন নিলাম। কিন্তু ক্রাউন প্রিন্স যখন প্রথম লেফটেনেন্ট পদে উন্নিত হলেন তখন রেজা শাহ্ তাঁকে চার বছরের সময়সীমা উপেক্ষা করে একই সাথে ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি দিলেন। ১৯৪১ সালে শাহ্ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রাউন প্রিন্স ক্যাপ্টেন পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৩৮ সনে মিশরের রাজা ফারুকের বোন প্রিন্সেস ফওজিয়ার সাথে মোহাম্মদ রেজা'র বিয়ে স্থির হয়। ধারণা করা হয় যে রাজা ফারুকদের মূল পূর্বপুরুষদের আবাস মিশরে ছিল না। তাছাড়া এ পরিবারটি ছিল দারুণভাবে বৃটিশ ঘেষা। অবশ্য এরা নিজেরাও দাবী করতেন যে তাদের পূর্বপুরুষেরা গ্রীস অথবা ইতালীর অধিবাসী।

এ বিয়ের ব্যাপারে মোহাম্মদ রেজা কিছুই জানতেন না। একদিন তিনি আমাকে বল্লেন, "খবর রাখ কি তোমার নাকের ডগায় কি ঘটছে? আমার বাবা মিশরের রাজা ফারুকের ভগ্নি ফওজিয়া'র সাথে আমার বিয়ে ঠিক করেছেন"।

বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ইরানের চীফ অফ প্রটোকল মোহাম্মদ জা'ম কায়রোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। দু সপ্তাহের কিছু আগেই তিনি মিশরের রাজা ফারুকের সম্মতি নিয়ে ফিরে আসলেন। রাজকুমারী ফওজিয়ার পরিবারকে তেহরানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ফওজিয়ার মাতা ও বোনেরা তেহরানে এলেন।

www.pathagar.com

গুলিস্তান প্রাসাদে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং ধর্মীয় ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয় মিশরে। ফওজিয়া ফার্সী জানতেন না, অপরদিকে মোহাম্মদ রেজা আরবী জানতেন না। তাই তাদের কথপোকথনের মাধ্যম ছিল ফরাসী ভাষা। পরবর্তীতে ফওজিয়া সামান্য ফার্সী ভাষা শেখেন।

বিয়ের পর মোহাম্মদ রেজা'র ব্যক্তিগত জীবন বলতে যা ছিল তা হলো অবসরে আমার ও পেরনের সাথে সময় কাটানো। ফওজিয়ার বিশ্বস্ত ছিল একজন মিশরীয় ভৃত্যা যে তাঁর সাথে আসে। তিনি ইরানিদের সাথে সখ্যতায় আগ্রহী ছিলেন না। শাহ্ পরিবারের সাথে বিশেষ করে মোহাম্মদ রেজার বোনদের সাথে তাঁর খুবই শীতল সম্পর্ক ছিল। এটা তাঁর স্বভাব ছিল এবং এটা তিনি ইচ্ছা করে করতেন বলে আমার মনে হয়না। তিনি তাঁর মিশরীয় ভৃত্যা ছাড়া আর যাদের সাথে মিশতেন তাঁরা হলেন ইরানে মিশরের রাষ্ট্রদূত ও তাঁর পত্নী। প্রতি সপ্তাহে অন্তত ২-৩ বার মিশরীয় রাষ্ট্রদূত ও তাঁর পত্নীকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানানো হতো। ফওজিয়া সাধারণত জনসমক্ষে আসতেন না। তাঁর স্বভাব ছিল ঘরমুখো। মোহাম্মদ রেজা সব সময়ই তাঁকে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার পরামর্শ দিতেন কিন্তু জবাব সব সময়ই না বোধক ছিল।

১৯৩৮ সালে রেজা শাহ্ তাঁর জৈষ্ঠ্যা কন্যা শামস্ ও আশরাফের বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন। পাত্রদ্বয়ের উভয়েই পাশ্চাত্য ঘেষা পরিবারের সদস্য। একজন ফ্রাদেউন জাম, যিনি চীফ অফ প্রটোকলের পুত্র এবং অপরজন ইব্রাহীম গাভামের পুত্র আলী গাভাম।

বিয়ের সময়ে ফ্রাদেউন জাম ছিলেন মিলিটারী একাডেমীর ছাত্র এবং আলী গাভাম কেম্‌ব্রিজে অধ্যায়নরত। এক সপ্তাহের মধ্যেই বিয়ে সম্পন্ন হলো। বিয়ের পর জাম মিলিটারী একাডেমীর দ্বিতীয় বর্ষে এবং গাভাম প্রথম বর্ষে ভর্তি হলেন। গাভাম, আমার ও মোহাম্মদ রেজা'র সহপাঠী হলেন। তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন না। রেজা সাহের জীবদ্দশায় শামস্ অথবা আশরাফ বিবাহ বিচ্ছেদের কথা উচ্চারণের সাহস পেতেন না কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর উভয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান। শামস্, মেহেরদাদ পাহ্লবোদকে বিয়ে করেন, আর ফ্রাদেউন জাম, শাহের প্রাক্তন কর্তী ফিরোজাহ্কে বিয়ে করেন। ফিরোজাহ্ প্রকৃতপক্ষে শাহের রক্ষীতা ছিলেন আর তাই জামের জন্য এ বিয়ে ফলদায়ক ছিল।

আশরাফকে ত্যাগ করার পর আলী গাভাম অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। আশরাফ কেবল একজন দুর্নীতিপরায়ণই ছিলেন না বরং বিকৃত যৌনতা ও উচ্ছৃংখল মানসিকতাসম্পন্ন ছিলেন।

www.pathagar.com

রেজা শাহের মানসিকতা ঃ

রেজা শাহ্ সন্দেহাতীতভাবে একজন কট্টর নিয়মানুবর্তিতাপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। এর কারণ কোসাক অফিসার হিসেবে তাঁর জীবন যাপন। রেজা শাহ্ সবসময়ই তাঁর পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে অথবা বাইরে সবসময়ই একজন ভৃত্য তাঁর কাছে কাছে থাকতো এবং ইশারা পাওয়া মাত্রই হুকুম পালন করতো।

প্রতিদিন দুপুর ১২ টার মধ্যে রেজা শাহ্ তাঁর মধ্যাহ্নভোজ সাড়তেন। বিকেল ৬ টায় মুরগীর কাবাবের সাথে এক গ্লাস ব্র্যান্ডি খেতেন। রাতের খাবার খেতেন ৮ টার মধ্যে। প্রতিরাতে তাঁর শয্যাপাশে দু'গ্লাস সাদা অথবা লাল ওয়াইন থাকতো। সাদ আবাদে একজন বিশেষজ্ঞ এ ওয়াইন তৈরি করতেন এবং ৫ বছর সংরক্ষণের পর তা ব্যবহৃত হতো। খাবারে অতিরিক্ত তেলযুক্ত খাদ্য ছিল তাঁর পছন্দ। চামচে পোলাও নিলে সে পোলাও থেকে তেল বেয়ে পড়তো। মোহাম্মদ রেজাকে তিনি বলতেন, "প্রচুর তেলে রান্না করা পোলাও আমার প্রিয় খাবার"। সাধারণত দুপুরের খাবারের মধ্যে থাকতো পোলাও, তরকারী, ইরানী কাবাব আর প্রচুর পরিমাণে সালাদ। রাতের খাবার প্রায় দুপুরের খাবারের অনুরূপ ছিল, শুধু নানাজাতের ফল ছিল বাড়তি আইটেম। নৈশভোজের সাথে সাথেই রেজা শাহ্ শয়নকক্ষে গমন করতেন। রেজা শাহ্ প্রায় সব সময়ই আফিম সেবন করতেন। তিনি বলতেন, নিয়মিতভাবে আফিম সেবনের ফলে তাঁর দেহে রোগ প্রতিরোধের ব্যাপক ক্ষমতা জন্মে। একজন ভৃত্য শুধু আফিম ও আফিম সেবনের সরঞ্জামের যোগান দিতেন।

মোহাম্মদ রেজা'র মাতাকে বিয়ে করার আগে রেজা শাহ্র আরেক পত্নি ছিল, যার নাম সফিনাহ্। রেজা শাহ্ সামরিক ইউনিটে অবস্থানকালে হামাদান শহরে সফিনাহ্কে দেখেন ও তাঁর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। সফিনাহ্'র গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্মে যার নাম হামেদান আল্ সালতানিহ্। রেজা শাহ্ ও সফিনাহ্'র বিয়ে এক বছর টিকে ছিল।

রেজা শাহ্'র দ্বিতীয় স্ত্রী'র নাম তাজ-আল্-মোল্ক। ইনি হলেন মোহম্মদ রেজার মাতা। তাজ-আল্- মোল্ক একজন রুশ রমনী যার প্রপিতা ইরানে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পিতা ইরানে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ছিলেন। রেজা শাহ্ তাজ-আল্ মোল্ক দম্পতির চার সন্তান। কন্যা শামস্ , মোহাম্মদ রেজা, কন্যা আশরাফ এবং আলী রেজা।

১৯২৭ সনে রেজা শাহ্ কাজার রাজ বংশের রূপশী বালিকা মালেকাহ্কে বিয়ে করেন। মালেকাহ্কে বিয়ের এক বছরের মাথাতেই রেজা শাহ্ তাঁকে তালাক দেন।

www.pathagar.com

মালেকাহ্ ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শনা, অল্প বয়েসী, বিনয়ী ও শিক্ষিতা। বিয়ের পর থেকেই তাজ-আল্-মোল্কের সাথে মালেকাহ্র বিতন্ডা চলতে থাকে। পরবর্তীতে রেজা শাহ্ একই বংশের ইশমত নামে অন্য এক রমনীকে বিয়ে করেন।

১৯২২ সনে আলী রেজা'র জন্মের পর তাজ-আল্-মোল্কের সাথে রেজা শাহের বৈবাহিক সম্পর্ক প্রায় ছিলনা বললেই চলে।

রেজা শাহ্ কখনোই তাঁর স্ত্রীদের সাথে থাকতেন না। প্রতি বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তিনি স্ত্রীদের প্রাসাদে যেতেন। তাঁর অন্যতম পছন্দের কাজ ছিল নরম জলে গা ডুবিয়ে ঐতিহ্যবাহী ইরানী মালিশ গ্রহণ।

মোহাম্মদ রেজা'র মা হিসেবে তাজ-আল্-মোল্ককে যদিও রেজা শাহ্ শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু তিনি ইসমত্কেই ভালবাসতেন।

পাহ্লভী রাজতন্ত্রের শুরুর দিকে তেইমরতাশ ছিলেন মূখ্যমন্ত্রী। তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। রেজা শাহ্ অবশ্য মন থেকে তেইমরতাশকে পছন্দ করতেন না। যখন তিনি নব ইরান পার্টির জন্ম দেন তার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারেন যে এটি পরোক্ষভাবে তেইমরতাশের পক্ষে চলে যায়; এবং এ উপলব্ধির পরই তিনি নব ইরান পার্টির বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।

রেজা শাহ্ কোন পার্টি বা মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি পুরোপুরিভাবে সেনা নির্ভর ছিলেন। তেহরানে সেনাবাহিনীর দু'টি ডিভিশন গড়ে তোলেন। এর একটির দায়িত্বে ছিলেন করিম আগা খান বাজারজোমেহ্রী এবং দ্বিতীয় ডিভিশনের নেতৃত্বে আলী আগা খান নাঘদী। রেজা শাহ্ সর্বদায় চেষ্টা করতেন যাতে এ দু'টি সেনা ডিভিশন একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। এছাড়াও তিনি দল দু'টিকে একে অন্যের প্রতি আগ্রাসী মনভাবাপন্ন করে তোলেন। প্রথম ডিভিশনের কমান্ডারের সামনে তিনি দ্বিতীয় ডিভিশনের কমান্ডারকে অযোগ্য আখ্যা দিতেন। অপরদিকে একই পন্থায় প্রথম ডিভিশনের কমান্ডারের অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় ডিভিশনের কমান্ডারের সামনে প্রথম ডিভিশন কমান্ডার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতেন। এছাড়াও এ দুটি ডিভিশনের গঠনপদ্ধতি সম্পুর্ণভাবে ভিন্নতর হওয়ায় এক ডিভিশনের সাথে অন্যটির সমন্বয়ও ছিল না। তবে প্রত্যেক ডিভিশনকে ব্যাপক হারে অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত করা হয় যার মধ্যে অধিকাংশই ছিল আধুনিক অস্ত্র। এ দুই ডিভিশনের একমাত্র অভিন্ন লক্ষ্য ছিল রেজা শাহের সিংহাসনকে রক্ষা করা। ১৯৪১ সনের ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ দু'টো ডিভিশনের উপর নির্ভর করেই রেজা শাহ্ তাঁর ক্ষমতাকে ধরে রাখতে সক্ষম হন। ১৯২০ সনের অভ্যুথানে যেসব সেনা অফিসার অংশ নেয়

www.pathagar.com

তাদেরকে ব্যাপকভাবে পদোন্নতি দেয়া হয়। বিপুল সংখ্যক সার্জেন্ট, লেফটেন্যান্ট এবং ক্যাপ্টেনকে জেনারেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়।

রেজা শাহ্ সর্বদাই চাইতেন তাঁর সেনা অফিসাররা যেন বিত্তবান হন। সেজন্য তিনি প্রায়ই তাদেরকে নির্দেশ দিতেন, "যেখানে সম্পদ পাও তা অর্জন করো"।

এ নির্দেশের পরোক্ষ উদ্দেশ্য হলো জনগণের সম্পদ লুট করা। আর এ নির্দেশের ফলে জেনারেলদের কালো থাবায় অসংখ্য ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তিতে অবাধ দখলদারীর তান্ডব চলে। প্রকৃত মালিকদের তাদের সম্পত্তির কোন মূল্য পরিশোধ না করেই জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্যের দশ ভাগের এমনকি একশ ভাগের এক ভাগ মূল্য পরিশোধ করেও জনগণের সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়া হয়।

কাজার শাসনামলে ইরানে কোন রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ ছিল না। রেজা শাহ্ও তড়িঘড়ি করে এ অবস্থার পরিবর্তন করতে চাননি। এর পেছনে সম্ভবত বৃটিশ কৌশল কাজ করেছে। কারণ বৃটেন কখনো চায়নি যে ইরানের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ গড়ে উঠুক। যদিও অভ্যন্তরিণ তথ্য সংগ্রহের জন্য রেজা শাহ্ পুলিশের 'নাজমিহ্' এবং 'সারবানী' নামক দুটি ইউনিটের উপর নির্ভর করতেন। অদক্ষ পুলিশ বিভাগ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে কোন ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মকান্ডের ব্যাপারে সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখতো।

রেজা শাহ্ যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নের কোজাক বাহিনীতে খুব নিম্ন পদ থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন তাই এ সুদীর্ঘ সময় ধরে এ বাহিনীতে থাকার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তাঁর বিশেষ দূর্বলতার জন্ম নেয়। রেজা শাহ্ সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বহু উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। রেজা শাহের রাজত্বের শুরুতে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্টদের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

জার্মানীতে নাজী ক্ষমতার চূড়ান্ত মূহুর্তে রেজা শাহ্ একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের নির্দেশ দেন। ডঃ মতিন দফতরীকে প্রধানমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। নয়া মন্ত্রিসভার পদক্ষেপ ইরানের সাথে জার্মানীর বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাড়িয়ে তোলে। ইরানে জার্মান বিশেষজ্ঞের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে বৃটিশ বিশেষজ্ঞের পরপরই জার্মান বিশেষজ্ঞের সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবস্থান দখল করে। কোকেশীয় প্রজাতন্ত্রে জার্মানদের অগ্রযাত্রার ফলে রেজা শাহ্ অধিক হারে জার্মানীর প্রতি

www.pathagar.com

অনুরক্ত হতে থাকেন। কিন্তু রেজা শাহের রাজ দরবারের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন বৃটিশ তাবেদার, তাই রেজা শাহের এহেন জার্মান প্রীতির খবর লন্ডনে পৌছতে সময় লাগেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরগুলোতে জার্মানীর পরাজয়ে রেজা শাহ্ সংকিত হয়ে পড়েন এবং বৃটেনের বিশ্বস্ত লোক হিসেবে পরিচিত মনসুর-আল্-মুলক্‌কে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। মনসুর, রেজা শাহকে জানান যে ইরানে জার্মান বিশেষজ্ঞদের অবস্থানের ফলে মিত্রবাহিনী অসন্তুষ্ট। এ খবর জানার পর রেজা শাহ্ মাত্র ২৪ ঘন্টা সময়ের মধ্যে ৬০০ জার্মান বিশেষজ্ঞকে ইরান থেকে বহিষ্কার করেন। এবং বহিস্কৃত জার্মানদেরকে তুরস্কের হাতে সমর্পন করা হয়। এ ব্যবস্থা নেয়ার পর রেজা শাহ্ নিজেকে নিরাপদ অবস্থানে নিয়েছেন মনে করলেন। কিন্তু ১৯৪১ সনের ১১সেপ্টেম্বর অপরাহ্ন ৪ টায় বৃটিশ-সোভিয়েত বাহিনী এবং মার্কিন বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মিত্রবাহিনী ইরানে অভিযান চালিয়ে দখল করে নিল। রেজা শাহ্ উপায়ান্ত না দেখে আত্মসমর্পন করলেন। তিনি রুশদের হাতে বন্দী হওয়ার ভয়ে অতি দ্রুত বিদেশে পালিয়ে গেলেন।

সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯৪১ রেজা শাহ্ তড়িঘড়ি করে ক্রাউন প্রিন্সকে ইরানের পরবর্তী শাহের দায়িত্ব দিয়ে তেহরান ত্যাগ করেন। এর আগে মর্মর প্রাসাদে'র এক কক্ষে রেজা শাহ্ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি বার্ধক্যে উপনীত তাই এখন ক্ষমতা হস্তান্তর আবশ্যক। এ পরিস্থিতিতে তিনি ক্রাউন প্রিন্সকে সমর্থন দেয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানালে সবাই সমবেত স্বরে বলে উঠলো "জ্বি হুজুর"। নিজের ছড়ি উচিয়ে সবার প্রতি বিদায় জানিয়ে তিনি গাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন।

রাতে ইস্পাহান পৌঁছে সেখানকার ধনাঢ্য ব্যক্তি কাজেরোনি'র বাসভবনে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলেন রেজা শাহ্। একই রাতে ক্বাভাম-আল্- মুল্ক শিরাজী এবং ডঃ সাজ্জাদী ইস্পাহান পৌছলেন। ক্বাভাম রেজা শাহ্‌কে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি যদি ইরান ত্যাগ করেন তাহলে আপনার বিষয়-সম্পত্তির কি হবে ? এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন"। ক্বাভামের সাথে পরামর্শক্রমে নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে দলিল সম্পাদন করে রেজা শাহ্ তাঁর সমুদয় সম্পদের মালিকানা ক্রাউন প্রিন্সকে প্রদান করে কিরমানের উদ্দেশ্যে ইস্পাহান ত্যাগ করলেন। ক্বাভাম-আল্-মুল্ক তেহরানে ফিরে গেলেন যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজসহ।

রেজা শাহ্ বিভিন্ন কৌশলে বিপুল ধন-সম্পদ ও জায়গা-জমিসহ স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করেন। সাধারণের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে বিশাল সম্পদ প্রায় জোড় করে লিখিয়ে নেয়া হতো। রেজা শাহের বিশাল সম্পত্তির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন মেজর জেনারেল করিম আগা খাঁন বোজারজোমেহ্‌রী।

www.pathagar.com

পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে বঞ্চিত করে রেজা শাহ্ তাঁর সম্পদের পাহাড় ক্রাউন প্রিন্সের নামে হস্তান্তরের প্রতিবাদে পাহ্লভী পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বিক্ষুব্ধ হয়। তারা এ বিষয়ে তাদের ক্ষোভ অব্যাহত রাখলে রেজা শাহ্ ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ রেজার কাছে একটি পত্র পাঠান। এ পত্রে তিনি পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে একটি করে প্যালেস এবং দশ লাখ টোমান্স পরিশোধের নির্দেশ দেন।

রেজা শাহ্ তাঁর শাসনকালের গোটাসময় জুড়েই সম্পদের প্রতি এক অনিবারণেয় ক্ষুধায় ভোগেন। তাঁর এ অদম্য সম্পদ ক্ষুধার সুযোগে অনেকেই তাঁকে ইরানের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলে বহু স্থাবর সম্পত্তি ঘুষ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা আদায় করেন। কি কি পন্থায় রেজা শাহ্ সম্পদ আহরণ করতেন তার বর্ণনা দিতে হলে কয়েক খন্ড বইয়ে কেবল সে কথাই লিখতে হবে । সম্মিলিত বাহিনী যখন ইরান দখল করে তখন বৃটেনের বিবিসি টেলিভিশন অবিরাম তিন দিন পর্যন্ত কেবল রেজা শাহের সম্পদের বর্ণনা দিয়ে উল্লেখ করে যে, রেজা শাহের শাসনামলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো উত্তর ইরানের বিস্তৃত সম্পদের মালিকানা গ্রহণ।

পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে নিয়ে রেজা শাহ্ কেরমানে পৌছেন এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে হারান্দী নামক এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে আশ্রয় নেন। কয়েক দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠার পর পূনরায় তিনি তাঁর যাত্রা শুরু করেন এবং বন্দর আব্বাস থেকে একটি বৃটিশ জাহাজে চড়ে বসেন। মোহাম্মদ রেজা ও কন্যা আশরাফ ছাড়া অন্যসব সদস্যই রেজা শাহ্র সফর সঙ্গী হন। স্ত্রীদের মধ্যে কেবল ইসমতকে সাথে নেন। অবশ্য কিছুকাল পর ইসমত ইরানে ফিরে আসেন।

রেজা শাহ্র পুত্রগণ আমাকে পরবর্তীতে জানান যে বৃটিশ জাহাজে আরোহণের পর রেজা শাহ্কে জানানো হয় যে তাকে বোম্বে পৌছে দেয়া হবে। কিন্তু বোম্বের কাছাকাছি পৌছার পর বৃটিশ কূটনীতিক স্যার ক্লারমন্ট স্ক্রাইন জাহাজে আরোহণ করেন এবং জানান যে , লন্ডনের নির্দেশক্রমে জাহাজ বোম্বের পরিবর্তে ভারত সাগরের দ্বীপ মরিশাশ যাবে। একথায় রেজা শাহ্ ক্ষুব্ধ হলেও তাঁর কিছুই করার ছিলনা। এ দ্বীপেই তাঁকে বাগান সম্বলিত একটি বাড়িতে থাকতে দেয়া হলো। কিন্তু মরিশাশ দ্বীপের আবহাওয়া গরম ও অসহনীয় হয়ে পড়লে শাহ্ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে অবশ্য তেহরানের বিশেষ উদ্যোগের ফলে রেজা শাহ্কে প্রথমে ডারবান এবং পরে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানসবার্গে স্থানান্তরিত করা হয়।

ইরান থেকে রেজা শাহের পলায়নের পর ইরানের পত্র-পত্রিকার পাতা জুড়ে রেজা শাহ্ শাসনামলের অজানা সব তথ্য প্রায় প্রতিদিন ছাপা হতে থাকে। এ অবস্থা কয়েক বছর

www.pathagar.com

ধরে চলতে থাকে। কোন কোন সময় আমি এসব পত্রিকার কপি মোহাম্মদ রেজাকে দেখাতাম। তিনি এগুলোতে চোখ বুলিয়ে বলতেন, "এসব সংবাদের প্রতিবাদ করা বা পত্রিকা নিষিদ্ধ করার অর্থ হয়না। সময় সব কিছুকে বদলে দেবে এবং মানুষ এগুলো পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়বে"।

মোহাম্মদ রেজার এমন ভাব আমাকে বিস্মিত করেছে। মনে মনে ভেবেছি, তাহলে কি পিতা-পুত্রের মধ্যে অদেখা এক ব্যক্তিত্বের সংঘাত নাকি পিতার প্রতি মোহাম্মদ রেজার হিংসাপরায়ণতা।

১৯৪৪ সনের ২৬-শে জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রেজা শাহ্ জোহান্সবার্গে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যেহেতু তখনো ইরানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি শান্ত হয়নি তাই তাঁর মরাদেহ মিশরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে ৬ বছর রাখার পর ১৯৪৯ সনে ইরানী মজলীস তাঁকে "দ্যা গ্রেট" উপাধি প্রদান করে এবং মিশর থেকে তাঁর মরাদেহ বিশেষ ব্যবস্থায় ইরানে নিয়ে এসে সমাহিত করা হয়।

মোহাম্মদ রেজা'র শাসনকালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে মোহাম্মদ রেজা ব্যাপকভাবে বৃটিশ ও মার্কিনীদের উপর নির্ভর করেন। সেনাসদস্যদের অধিকাংশই মানসিকভাবে স্থবির হয়ে পড়ে এবং এদেরকে প্রায় স্থায়ীভাবেই সেনানিবাসে সীমাবদ্ধ রাখা হত। শাহ্ নিজে সামরিক ও সরকারী কাজে স্বল্প সময়ে মননিবেশ করতেন এবং প্রধানন্ত্রীই মূলত শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। শুধু আনুষ্ঠানিকতার স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী নিজে মাঝে মাঝে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সমস্যা ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে শাহের পরামর্শ বা সম্মতি নিতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তার এ মনোভাব পরিবর্তন করেন এবং আজারবাইজানের স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে কাভাম-আল্- সাল্তানেহ্‌র সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে শাহ্ সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আজারবাইজানের ইরানে প্রত্যাবর্তনকে একটি বিরাট বিজয় হিসেবে গণ্য করেন। আর তখন থেকেই তার আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি ধীরে ধীরে স্বৈরতন্ত্রী মনোভাব দেখাতে থাকেন। আজারবাইজান ইস্যু শাহের মন-মানসিকতায় বিরাট প্রভাব ফেলে; তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন এবং কাভাম'র সাথে তার মতপার্থক্য সম্প্রসারিত হয়। ১৯৪৭ সনে কাভামের পতনের পর শাহ্ রাজমারাকে নিয়োগ করেন তাঁর আনুগত্য এবং বাধ্যতার কারণে। রাজমারা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে শাহের আদেশ পালন করতে থাকেন। অবশ্য তিনি খুবই উচ্চাভিলাষী ছিলেন। রাজমারা'র সাথে ইরানের কমিউনিষ্ট পার্টি 'তুদেহ'-এর গোপন যোগযোগ ছিল। এছাড়াও তিনি বৃটিশ ও মার্কিনীদের সাথেও সম্পর্ক রাখতেন।

www.pathagar.com

রাজমারা যদিও একজন নামকরা সেনা কর্মকর্তা ছিলেন কিন্তু তিনি একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তিনি সবসময়ই তার লক্ষ্যবস্তু অর্জনে তাড়াহুড়া করতেন। তার লক্ষ্যস্থল ছিল ক্ষমতার সর্বোচ্চ পর্যায়। ১৯৪৮ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শাহের অসফল হত্যা প্রচেষ্টার পেছনের রাজমারার হাত ছিল বলে যে কথা শোনা যেত তা উড়িয়ে দেয়া যায় না। পুলিশ কর্তারা পরে দাবী করেছিলেন যে রাজমারার পকেট নোট বই থেকে শাহের হত্যা প্রচেষ্টার পেছনে তার হাত ছিল এমন প্রমান স্বরূপ তথ্য লাভ করেন। অবশ্য নোট বইয়ের বিষয়বস্তু আমাকে দেখানো হয়নি। রাজমারা ইরানের পেট্রোলিয়াম শিল্পের জাতীয়করণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। একই সাথে মোসাদ্দেঘ এবং তার সমর্থকরা এ শিল্পের জাতীয়করণের দাবীতে রাজ দরবারের সামনে প্রতিদিন বিক্ষোভ সমাবেশ করতেন।

মোসাদ্দেঘ যখন প্রধানমন্ত্রী নিয়োজিত হলেন তখন শাহের সাথে তার ক্ষমতার লড়াই চরমে উঠলো। শাহ্ কোনভাবেই আর সংবিধান মেনে চলতে আগ্রহী ছিলেন না; তিনি নিজেকে সবার উপরে এবং সব দায়িত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে চান। যদি শাহ্ পূর্বের মত সহনশীল থাকতেন তবে কাভাম বা মোসাদ্দেঘদের কেউই তাঁর ইরান ত্যাগের দাবী তুলতেন না। শাহ্ ইচ্ছে করলেই সামান্য সৌজন্যমূলক আচরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে মোসাদ্দেঘের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে পারতেন। শাহ্-মোসাদ্দেঘ দ্বন্দের অবসান ঘটে যখন জেনারেল জাহিদী'র নেতৃত্বে সংঘটিত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোসাদ্দেঘ ক্ষমতাচ্যুত হন এবং শাহর সর্বময় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় পর্যায় হলো শাহ্ এর দীর্ঘ ও একক রাজতন্ত্র। এ সময়ে সরকার-সংসদ এসব কিছুই শাহের হুকুমের গোলামে পরিণত হয়। জনগণের সম্পদ-ঐতিহ্য পরিণত হয় শাহের খেলনায়। তিনি ইচ্ছে করেই সমাজ ও সামাজিক ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে বদলে দেন যার ফলে তাঁর শাসনকাল শেষ হওয়ার পরও বিপর্যস্ত সমাজ গঠনে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। শাহ্ তাঁর প্রধানমন্ত্রী অথবা সাংসদকে কোন কাজ করার সুযোগ দিতেন না। যে প্রধানমন্ত্রী ও সাংসদ তাঁর প্রতি অবিচল আস্থাশীল ও অনুগত থাকতো তাকেই তিনি শ্রেষ্ঠতম গণ্য করতেন। শাহ্'র ইচ্ছা পুরণের সবচেয়ে আগ্রহী ব্যাক্তি হিসেবে হোভেয়দাহ্ শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রীতে পরিণত হন।

আগষ্ট অভ্যুত্থানের পর শাহ্ তার পিতার মতোই ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। শুধুমাত্র বাহ্যিক আবরণেই পিতা-পুত্রের শাসনের কোন পার্থক্য ছিল। আমার মতে, রেজা শাহ্ মোহাম্মদ রেজার তুলনায় কম ভুল করেছিলেন। তিনি সামাজিক রীতি-নীতি অপেক্ষাকৃত কম সন্ত্রাসের মাধ্যমে পরিবর্তন করেন। শিল্পের

www.pathagar.com

বিনিয়োগ সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হতো। আর স্বাভাবিকভাবেই মূদ্রাস্ফিতির হার ছিল কম। শহরগুলোর জনসংখ্যাও মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়েনি। রেজা শাহ্‌র শাসনামলে তেহরানের জনসংখ্যা ছিল তিন লাখ এবং শহরটি একটি কোলাহলমুক্ত নীরব শহর হিসেবে বিবেচিত হতো। তেল সম্পদ থেকে সংগৃহীত আয় সামরিক খাতে ব্যবহৃত হতো। অন্যান্য চাহিদাগুলো তেল সম্পদ বহির্ভূত অন্য খাত থেকে সংগৃহীত রাজস্ব থেকে পূরণ করা হতো। সরকারের আকার ছোট রাখা হতো যাতে ব্যয় কম হয়। বড় প্রকল্পগুলোর মধ্যে সড়ক নির্মাণ ছিল অন্যতম।

আমার মতে, রেজা শাহ্ সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মোহাম্মদ রেজার চেয়ে কম ভূল করেন। রেজা শাহ্‌র ব্যক্তিত্ব এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিত্বের পার্থক্য তাদের দু'জনের ব্যক্তিগত জীবনে সর্বদাই প্রতিফলিত হতো। রেজা শাহ্ তাঁর নিজস্ব হিটারে (তাপযন্ত্রে) ব্যবহৃত কাঁঠেরও ওজন নিতেন অথচ মোহাম্মদ রেজা তার স্ত্রীসকল, সন্তান ও বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের পেছনে কোটি কোটি টোমান্স ব্যয় করতেন। রেজা শাহ্ ইরানের বাইরে তুলনামূলক স্বল্প অর্থ পাচার করে জমা করেন কিন্তু মোহাম্মদ রেজা ইরানের বাইরে ব্যাপক সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার জন্য দেশটিকে প্রায় লুট করেন। রেজা শাহ্ মাত্র কয়েকশ ইরানী শিক্ষার্থীকে বিদেশে শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠাতেন। অপরদিকে তাঁর পুত্র মোহাম্মদ রেজা হাজার হাজার ইরানী ছাত্র-ছাত্রীকে বিদেশে লেখাপড়ার জন্য পাঠান এবং তাদের প্রায় প্রত্যেকেই স্বদেশে ফিরে আসে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণার বাহক হিসেবে। রেজা শাহ্ জীবনে মাত্র একবার বিদেশ সফরে যান। তাঁর প্রথম এবং একমাত্র সংক্ষিপ্ত বিদেশ সফর ছিল তুরস্কে। বিদেশী অতিথি আমন্ত্রণও ছিল সীমিত। কিন্তু মোহাম্মদ রেজা প্রতি বছরই কয়েকবার বিদেশ সফরে যেতেন এবং অগণিত বিদেশী অতিথিকে আমন্ত্রণ করে ইরানে এনে তাদের পেছনে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হতো।

রেজা শাহ্ তাঁর আত্মজীবনী লিখে যাননি। যদি যেতেন তবে তা খুবই মূল্যবান তথ্য সমৃদ্ধ হতো। পাঠকরাও অনেক অজানা তথ্য জানতে পারতেন। কিন্তু মোহাম্মদ রেজা বেশ কয়েকটি বই রেখে গেছেন। তাঁর সম্পর্কে লেখার জন্য লেখক ও সাংবাদিকদের তাগিত ও অনুপ্রেরণা দেয়া হতো। মোহাম্মদ রেজা সম্পর্কে প্রশংশাসূচক গ্রন্থ অথবা ফিচার লেখক- সাংবাদিকদের ব্যাপকভাবে পুরস্কৃত করা হতো।

এতে সন্দেহ নেই যে রেজা শাহ্ দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন এবং জনগণের সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করেন যার পরিণতিতে তাঁর পতন হয়; কিন্তু মোহাম্মদ রেজার তুলনায়

www.pathagar.com

তাঁর কৃতকর্মের মাত্রা যৎসামান্যই বলা চলে। রেজা শাহ্ ও তাঁর পুত্রকে সবসময়ই একদল অদেশপ্রেমী ঘিরে থাকতো যাদের ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য ছিল কম কিন্তু স্বার্থ-সিদ্ধির মতলব ছিল বেশি। পরিবেষ্টনকারীরা পশ্চিমা সংস্কৃতির ধারক ছিল বলে তাদের নৈশ প্রমোদের বর্ণনায় শুধু সুরা আর রমনী ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। মোহাম্মদ রেজার শাসনামলে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে অনেকেই বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছেন যাদের বেশিরভাগেরই ব্যবসা শুরু করার মত প্রাথমিক পুঁজি পর্যন্ত ছিলনা। মোহাম্মদ রেজার পরোক্ষ নির্দেশে ব্যাংক এসব সুযোগ সন্ধানী পুঁজিহীনদের অবাধে ঋণ দিয়েছে এবং সামান্যতম সময়ের মধ্যেই এরা বিশাল বিত্ত-বৈভব আর খ্যাতির অধিকারী হন। এদের মধ্যে যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যায় তারা হলেন ক্বারাজ টেক্সটাইল ইন্ডাষ্ট্রিজের মোঘাদাম, আহ্ওয়াস পাইপস্ প্লান্ট-এর রেজাঈ, ইস্পাহানের আতাশ সংবাদ পত্রের মালিক মীর আশরাফী প্রমুখ।

মোহাম্মদ রেজার শাসনকালের প্রথমভাগ রুশ-ব্রিটিশ-মার্কিনীদের ইরান দখলের (সেপ্টেম্বর, ১৯৪১) সমসাময়িক ঘটনা ঃ

রুশরা আট ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করে যার মধ্যে ছয় ডিভিশন সৈন্য আজারবাইজান প্রদেশে মোতায়েন করা হয়। তেহরানের সড়কে রুশ সৈন্যদের দেখা যায়নি। তারা নাদেরী ষ্ট্রিটে একটি সামরিক পেরেডের আয়োজন করে এবং কয়েকজন আর্মেনীয় তাদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছাসহ স্বাগত জানায়। প্রায় সত্তুর হাজার আর্মেনীয় শ্রমিক ও কৃষক সোভিয়েত দূতাবাসের উৎসাহে তেহরানে পাড়ি জমায় এবং পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর তেহরানে বসতী গড়ে তোলে। রুশ সৈন্যরা তেহরানের পশ্চিমাঞ্চলের রাস্তাঘাটের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। আর্মেনীয় বসতী এবং সোভিয়েত সৈন্যদের অবস্থানকে বিবেচনায় নিলে এমনটি ধরে নেয়া যেত যে তেহরান তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে।

এসব কিছুর পরও কোন রুশ সৈন্যকে তেহরানে দেখা যেতনা। একটা বিশ্বস্ত সূত্র পরে আমাকে খবর দেয় যে সোভিয়েত সৈন্যদের কমান্ডার তাদেরকে জনগণের সামনে আবির্ভূত না হওয়ার নির্দেশ দেন এবং নির্দেশ অমান্যকারীকে কঠোর শাস্তি প্রদানেরও হুমকি দেন। ব্রিটিশ সৈন্যরাও অধিকাংশ সময় ক্লাবেই কাটাতো এবং জনসমক্ষে তেমন একটা আসতোনা। এক্ষেত্রে মার্কিন সৈন্যরাই ছিল, ব্যতিক্রম। উত্তর তেহরানের আমিরাবাদ এলাকায় তাদের একটা ক্লাব ছিল যেটি তাদের অফিসারদের মিলনস্থল ছিল। সৈন্যরা প্রতিদিনের জন্য যে খাদ্য সামগ্রীর বরাদ্দ পেত তা ৫-৬ জনের জন্যে যথেষ্ট ছিল। বরাদ্দকৃত রেশনে থাকতো নানা ধরনের টিনজাত খাবার, রুটি, প্রাত্যহিক গৃহীতব্য

www.pathagar.com

ভিটামিন, দুই বোতল হুইস্কি ও দুই প্যাকেট সিগারেট। মার্কিনীরা তাদের ক্লাবগুলোকে প্রায় পতিতালয়ে পরিণত করে। মার্কিন সৈন্যদের লরিগুলো শহরময় ঘুরে বেড়াতো আর মেয়েদের নিয়ে ক্লাবে পৌছে দিত। কখনো কখনো মেয়েরা মার্কিন লরিতে উঠে মার্কিন ক্লাবে গিয়ে সৈন্যদের মনোরঞ্জনের আশায় সারিবদ্ধভাবে রাস্তার পাশে অপেক্ষা করতো। মনে হতো যেন বাসের প্রতীক্ষায় আছে। লরিগুলো ২০০ থেকে ৩০০ মেয়ে নিয়ে যেত। মার্কিন সৈন্যরা অবশ্য খুব একটা টাকা পয়সা দিত না তবে মনোরঞ্জনকারী মেয়েদের প্রচুর খাদ্যসামগ্রী দিত । আমি একজনকে চিনতাম যে মার্কিন ক্লাবে যেত এবং প্রচুর খাদ্য সামগ্রী পেত যা বিক্রী করলে যথেষ্ট অর্থ উপার্জিত হতো।

মার্কিন ক্লাবে যাতায়াতকারীনীদের মাঝে মোহাম্মদ রেজা'র এক খালাও ছিলেন। তাঁকে আমি সাবধান করে বলেছি মার্কিনীরা তাঁকে পতিতায় পরিণত করছিল, কিন্তু জবাবে তিনি তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছেন "মার্কিনীরাতো আমাদের মতোই মানুষ ওদের সাথে মিশতে আপত্তি কোথায়।

আমি আগেই বলেছি মিঃ ট্রুট এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এটা সম্মত হয় যে মোহাম্মদ রেজা ইরানের শাহ্ হিসেবে শপথ নেবেন। ১৭ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ রেজা শপথ গ্রহণের জন্য মজলিশে গেলেন। কয়েকজন অতি চাটুকার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা শাহের সাথে মোটরযানে করে মজলিশ পর্যন্ত গেলেন। একটা আনুষ্ঠানিক প্রহরীদল শাহ্কে এসকর্ট করে নিয়ে গেল। তিন থেকে চার ঘন্টা স্থায়ী আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে শাহ্ শপথ নিলেন। ফরোওঘি আবার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। আমি এসব অনুষ্ঠানে যোগ দিইনি।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ফরোওঘিকে প্রধানমন্ত্রী করা হয় ব্রিটিশদের ইচ্ছায়। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এ পদের জন্য আগ্রহী ছিলেন না এবং ঘরে বসে অধ্যায়নে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্ব শাহের জন্য উপকারী হয়েছিল এবং অনেক বিরোধিতার মাঝেও শাহ্র সিংহাসন অক্ষুণ্ন ছিল। মজলিশের আনুষ্ঠানিকতার পর শাহ্ আমাকে বল্লেন, "হোসেইন, তুমি আমার পরবর্তী কামড়ায় বসো এবং আমার ব্যক্তিগত ও বিশেষ সহকারী হিসেবে কাজ করো।" তাঁর প্রাসাদ তখন মার্বেল প্যালেসের সামনে অবস্থিত ছিল এবং এর নাম দেয়া হয়েছিল "স্পেশাল প্যালেস"। আমি শাহের ব্যক্তিগত কক্ষের পার্শ্ববর্তী কক্ষটিতে বসি এবং আমাকে সহায়তা প্রদানের জন্য দু'জন বেসামরিক কর্মচারীকে নিয়োগ করা হয়। পুরো অফিসটাই খুব সাদামাটাভাবে সাজানো হয়। মন্ত্রীবর্গ, মজলিশের সদস্যবৃন্দ এবং রাষ্ট্রীয় দূতরা শাহের সাথে দেখা করতে পারতেন খুব সহজেই। বিশেষ কোন আনুষ্ঠানিকতার বালাই ছিলনা। দর্শনার্থীদের আমার কক্ষেই মাত্র

www.pathagar.com

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হতো। তাঁদের চা দিয়ে আপ্যায়িত করা হতো। যারা শাহ্'র সাথে দেখা করতে আসতেন তাঁরা খুব সন্তুষ্ট হয়েই ফিরে যেতেন। অনেকেই আমাকে বলতেন, "পিতার তুলনায় তিনি একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তিনি খুব নম্রভাষী এবং অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন।" আমি শাহ্কে এ ব্যাপারগুলো জানাতাম এবং তিনি খুব খুশী হতেন।

শাহের শাসনের দিনগুলোয় অনেকজন প্রধানমন্ত্রী পাল্টানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীদের অনেকেই বৃটিশদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ ও বিশেষ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। কেউ কেউ আবার বৃটেন থেকেই স্নাতোকত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। আচার-আচরণে তারা প্রায় ইউরোপীয় ছিলেন।

শাহের শাসনকালের প্রথম বছরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ইরানে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার রিডার বুলার্ড-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক। বুলার্ডের সাথে শাহের সম্পর্ক ভাল ছিলনা। শাহ্ নিজে আমাকে বলেছেন বুলার্ড খুবই বেয়াদব এবং নিতিবাচক মনোভাবাপন্ন কূটনীতিক। তিনি পরবর্তীতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান বুলার্ডকে প্রত্যাহারের জন্য। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে এমনকি বুলার্ড সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য পর্যন্ত করে। শাহের কাছে লেখা পত্রে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বলে, "সব লোকেরই একটা বিশেষ স্বতন্ত্র চরিত্র আছে। আপনি যদি সেটা উপলব্ধি করেন তবে নিশ্চয়ই আপনাদের সম্পর্কের উন্নতি হবে।" যাইহোক ব্রিটিশরা বুলার্ডকে তাঁর মেয়াদকালের পুরো সময়েই তেহরানে রাখে। বুলার্ডের সাথে আমার কয়েকবার দেখা হয়েছে। তিনি অত্যন্ত দাম্ভিক প্রকৃতির ছিলেন। বৃদ্ধ এ কূটনীতিকের আচরণ অনেকটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অফিসারদের মতো।

এখানে আমি একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে আমার বিবেচনায় শাহ্কে ব্রিটিশ ও তাদের সহযোগীরাই ক্ষমতায় বসিয়েছিল। ট্রোট ছিল ব্রিটিশ দূতাবাসের গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা। শাহ্কে ক্ষমতায় বসানোর পেছনে বৃটেনের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কগুলো কাজ করেছে। তবে এক্ষেত্রে শাহের সাথে বুলার্ডের ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে সম্পর্কের ফাটল ছিল তার কারণ রাষ্টদূত নিজেও জানতেন না ব্রিটিশ গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের স্ট্রাটেজির কথা। রাষ্ট্রদূতকে কেবল কিছু বিশেষ বিষয়ের তথ্য জানানো হতো, বাকীটা গোপন থাকতো গোয়েন্দা বিভাগ আর লন্ডনস্থ গোয়েন্দা দফতরের মাঝে।

১৯৪৩ সনের ডিসেম্বরে বিশ্বের তিন পরাশক্তির নেতারা তেহরানে আসেন একটি সম্মেলনে। সম্মেলনটি সোভিয়েত দূতাবাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং শাহ্ এতে যোগদান

www.pathagar.com

করেন। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো যুদ্ধ শেষ হওয়ার ছয় মাস পর ইরান থেকে সম্মিলিত বাহিনী প্রত্যাহার। সম্মেলনে ইরানকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের সেতু হিসেবে অভিহিত করা হলো। অবশ্য এটা ইরানকে প্রশংসার জন্য নয় বরং বিশ্বকে বুঝানোর জন্য যে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন সহযোগীতা না পেলে (ইরানের মধ্য দিয়ে) জার্মানীকে পরাজিত করতে পারতো না। সম্মেলনের সময় রুজভেল্ট ও চার্চিল ইরানের শাহ্'র সাথে কোন ব্যক্তিগত আলোচনায় মিলিত হওয়ার বিষয়টি নাকচ করে দেন তবে সোভিয়েত নেতা ষ্ট্যালিন ব্যক্তিগতভাবে শাহের সঙ্গে দেখা করতে আসেন । ষ্ট্যালিনের এ বৈঠকের ব্যাপারে আহ্‌মেদ আল্ সাপেহ্‌র আমাকে আগাম খবর দেন যে যেহেতু রুজভেল্ট ও চার্চিল শাহের সাথে ব্যক্তিগত বৈঠকে বসতে অসম্মতি জানিয়েছেন তাই তারই (সাপেহ্‌র-এর) পরামর্শে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ষ্ট্যালিনকে প্রস্তাব দিয়েছেন শাহের সাথে বৈঠকের। রাষ্ট্রদূতের পরামর্শে ষ্ট্যালিন রাজী হন।

ষ্ট্যালিনকে মার্বেল প্যালেসে আড়ম্বরপূর্ণ সম্বর্ধনা জানানো হয় এবং উভয়পক্ষই যথেষ্ট আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন। প্রায় আধ ঘন্টাব্যাপী এ বৈঠকের ছবি তোলার জন্য বেশ কয়েকজন ফটোগ্রাফার আনা হয়। অবশ্য ষ্ট্যালিনের এ বৈঠক ইরান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারে কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখেনি।

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শাহ্ এ ঘটনার কথা অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের সাথে স্মরণে রাখেন এবং তাঁর "আন্‌সার টু হিস্টরী" নামক গ্রন্থে এর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।

ডঃ মেজবাহ্ জাদেহ্‌র কথা ঃ

ডঃ মেজবাহ্ জাদেহ্ প্যারিস থেকে আইন শাস্ত্রে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। চাল চলনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত চৌকষ ও চতুর। ব্রিটিশদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল। তাঁর পিতা ছিলেন ইব্রাহীম ক্বাভাম আল্-মোলক্ শিরাজীর সেবাভৃত্য। সিরাজীর ফার্স প্রদেশে ৩-৪ শ গ্রাম ছিল যেগুলো যথাযথভাবে শাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য তাঁর বেশ কয়েকজন সেবাভৃত্য ছিল। মেজবাহ্ জাদেহ্‌র পিতাও তেমনি একজন ছিলেন, এবং স্বাভাবিকভাবেই এ কাজের মাধ্যমে তিনি তাঁর ভাগ্য গড়ে তোলেন এবং নিজ পুত্রকে শিক্ষালাভের জন্য প্যারিসে পাঠান। সম্ভবত ১৯৪১ সনে আমার নজরে পড়ে যে মেজবাহ্ জাদেহ্ আমার দপ্তরের আশে পাশে ঘুরাঘুরি করছেন। তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার সাথে কথা বলতে চাইলেন। আমি সম্মতি দিলাম। তিনি বল্লেন, "আপনি যদি শাহের সাথে একটা মিটিংয়ের ব্যবস্থা করে দেন তবে তাঁর কাছে আমার পরিকল্পনা সবিস্তারে উল্লেখ করবো।" আমি বললাম তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিতে।

www.pathagar.com

তিনি জবাব দিলেন, "আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে এ মুহূর্তে 'এত্তালাত্' সংবাদপত্রটি খুব ভাল অবস্থান সৃষ্টি করে ফেলেছে যা ঠিক নয়। এত্তালাত প্রকাশক মাসুদি একজন ব্যবসায়ী মাত্র। তাই তাঁর মূল লক্ষ্য ব্যবসা—সাংবাদিকতা নয়। সে তাদের পক্ষেই লিখে যারা তাঁকে বেশি পয়সা দেয়। এ মুহূর্তে দেশে একটা ভাল সংবাদপত্রের খুব অভাব। তাই আমি ও আমার কয়েকজন শিক্ষিত বন্ধু মিলে একটা নিরপেক্ষ পত্রিকা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এ বার্তাটি শাহের কাছে পৌঁছে দেন।"

আমি শাহ্‌র কাছে মেজবাহ্ জাদেহ্'র পরিকল্পনার কথা পৌছে দিলাম। শাহ্ নিজেও এত্তালাতের উপর খুশী ছিলেন না। কারণ এর প্রকাশক মাসুদি রেজা শাহ্'র সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেই ইরানের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হন। কিন্তু ১৯৪১-এর পর তাঁর এত্তালাত পত্রিকাতেই শাহের ভাইদের সম্পর্কে কটুক্তিমূলক সংবাদ ছাপা হয়। শাহ্ মেজবাহ্ জাদেহ্'র প্রস্তাবে একমত পোষণ করেন এবং তাঁরই নির্দেশে মেজবাহ্ জাদহ্'র সাথে তাঁর বৈঠকের ব্যবস্থা করে দিলাম। বৈঠক হলো দীর্ঘস্থায়ী।

মেজবাহ্ জাদেহ্ শাহ্‌কে পুরো ব্যাপারটা সবিস্তারে বুঝালেন। মোহাম্মদ রেজা তা ৎক্ষণিকভাবেই সম্মতি দিলেন। এবার মেজবাহ্ জাদেহ্ আর্থিক সহযোগিতা চাইলেন। শাহ্ রাজী হলেন এবং আমাকে আদেশ দিলেন ব্যবস্থা গ্রহণের। আমি মেজবাহ্ জাদেহ্‌কে প্রশ্ন করলাম কত লাগবে। তিনি বললেন দুই লাখ টোমানস্। শাহ্ আমার হাতে একটা চেক দিয়ে বললেন, "টাকাটা দিয়ে রশীদ নিয়ে নাও"। আমি চেক মেজবাহ্ জাদেহ্‌কে দিলাম। কিন্তু মেজাবাহ্ রশিদ দিলেন না, বললেন এটা ঠিক হবেনা। তিনি বল্লেন রশিদের বদলে তিনি এ পত্রিকার মালিকানাধারী কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর করবেন। মেজবাহ্ জাদেহ্ তাঁর কথামত দুই লাখ টোমানস্ সমমূল্যের শেয়ার তাঁর প্রকাশিত কেয়হান পত্রিকার মালিকানাধারী কোম্পানীর পক্ষে শাহ্‌কে হস্তান্তর করলেন।

শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো আমি শাহের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, "কেয়হান পত্রিকার শেয়ারগুলো তোমায় দিয়ে দিলাম। এগুলো তুমিই রাখো।" আমি ভাবতে লাগলাম এগুলো কোথায় রাখবো, কারণ এগুলোর মূল্য অনেক। প্রথমে ভাবলাম মেলি ব্যাংকের লকারে রাখবো, কিন্তু পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নিলাম এগুলো আমার পুরনো বাড়ির নীচতলায় গোপন কোঠরে রাখবো। এখনো সেগুলো ভেসাল শিরাজী সড়কের শাহ্নাজ আলী নামক আমার বাড়ির গোপন কোঠরেই থাকার কথা।

কেয়হান প্রকাশিত হওয়ার নয় মাসের মাথাতেই এটি এত্তালাতের চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করলো এবং অনেক সামনে এগিয়ে গেল। কেয়হান বিদেশ থেকে

www.pathagar.com

অত্যাধুনিক ছাপার মেশিন আমদানি করলো । আর এভাবেই মাত্র নয় মাসে কেয়হান পত্রিকা এত্তালাতের জন্য এক বিরাট হুমকিতে পরিণত হলো।

মেজবাহ জাদেহ্ খুবই উচ্চাভিলাষী ছিলেন। একদিন তিনি আমার কাছে এসে বন্দর আব্বাস থেকে জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করলেন। আমি শাহ্‌কে এ ব্যাপারটা জানালাম এবং তিনি বন্দর আব্বাসের কমান্ডারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদানের নির্দেশ দিতে বললেন। মেজবাহ্ জাদেহ্ পরবর্তীতে বন্দর আব্বাসের জান্দারমেরি অঞ্চলের কমান্ডারকে সাথে নিয়ে আসলেন। দেখলাম এদের দুজনের মাঝে খুবই আন্তরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। কমান্ডারকে আমি শাহ্'র নির্দেশের কথা জানালাম। তিনি বললেন, "আদেশ পালনে আমি প্রস্তুত"। কিন্তু পরবর্তীতে ব্রিটিশ দূতাবাসের অন্যরূপ ইচ্ছে থাকায় তাদের পছন্দের প্রার্থী আব্দুল্লাহ ঘালেন্দারী নির্বাচিত হন। অবশ্য পরে শাহের সহযোগিতায় মেজবাহ্ জাদেহ্ অন্য নির্বাচনে নির্বাচিত হন।

মেজবাহ্ জাদেহ্ অতি দ্রুত একজন সম্পদশালী বিত্তবানে পরিণত হলেন। কেয়হানের শেয়ারের বিপরীতে তিনি কখনোই কোন লাভ ঘোষণা করেননি। তিনি 'ইরান জাভান' ক্লাবের মালিক বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী জাফর এতেহাদি'র কন্যাকে বিয়ে করেন। পরবর্তীতে শাহের সাথে তিনি সরাসরিই দেখা করতে পারতেন এবং আমার সহযোগিতার আর প্রয়োজন ছিলনা। এভাবে ১০—১৫ বছর অতিবাহিত হলো। আমি জেনারেল ইন্সপেক্শন অফিসের প্রধান নিযুক্ত হওয়ার পর মেজবাহ্ জাদেহ্ আমার সাথে দেখা করতে এলেন। আমি তাঁকে দেখে অবাক হলাম আর তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, "আমি আগের মেজবাহ্ জাদেহ্ই আছি এবং সর্বদাই আপনার সেবায় নিয়োজিত।"

মোহাম্মদ রেজা ধীরে ধীরে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে সচেষ্ট হলেন। তিনি 'গার্ড-এ- জাভিদান' নামে স্থায়ী বাহিনী গঠন করলেন।

প্রতি প্লাটুনে ৩০ জন সেনা, একজন সার্জেন্ট ও একজন প্লাটুন কমান্ডার নিয়ে গড়ে উঠলো গার্ড-এ -জাভিদান। রেজা শাহ্ ইরান ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে, তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিশেষ নিরাপত্তা প্রদানে নিয়োজিত ছিল গার্ড-এ- জাভিদানের ৩০০ জন সদস্য। গার্ডের সদস্য নির্বাচন হতো যথাযথ বাছাই পর্বের পর এবং এদের প্রত্যেককে ব্যাপক ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি মার্শাল আর্টও শেখানো হতো।

শাহ্ তাঁর ক্ষমতাকে আরো পরিণত ও অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য কোয়েসী মিলিটারী পার্টি ও দল গঠন করেন। এ পার্টি ও দলগুলো শাহের কট্টর সমর্থকে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

শাহ্ গঠিত দলসমূহের মধ্যে একটির নাম 'সোম্‌কা'। দাভোদ মোন্‌শীজাদেহ্ এ দলের সংগঠক- প্রতিষ্ঠাতা। এ দলের সদস্যরা শাহের শত্রুদের বিরুদ্ধে সড়ক সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। সোম্‌কা দলের সদস্যরা শহরের যেকোন এলাকায় একটা অট্টালিকা ভাড়া নিয়ে সেখান থেকে সাংগঠনিক কাজকর্ম চালাত। প্রতি সপ্তাহে বৈঠক হতো এবং সড়ক সংঘর্ষের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি নির্ধারিত হতো। দলের সদস্যরা নিজেদেরকে "শাহ্ পুজারী" হিসেবে অভিহিত করতো।

সোম্‌কা দলের প্রতিষ্ঠাতা মোন্‌শীজাদেহ্ একজন হিটলার ভক্ত ছিলেন এবং নিজে ঠিক হিটলারের মতোই গোঁফ রেখেছিলেন। এ দলের নিয়মানুবর্তীতা, পোশাক, স্যালিউট, বক্তৃতার ধরন সবই ছিল হিটলারীও পদ্ধতির। এমনকি দলের প্রতীকও ছিল সোয়াস্তিকার অনুরূপ। সোম্‌কা'র সদস্যরা ছিল অনূর্ধ্ব বিশ বছর বয়েসী এবং পোশাক পড়েই তারা রাস্তায় আবির্ভূত হতো।

সোম্‌কা দলের মতোই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাসান আরফা'র নেতৃত্বে আরেকটি দল গঠিত হয় যার নাম "আরিয়া পার্টি"। আরফা কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে নিয়ে এ দলটি গঠন করেন। জেনারেল আরফা গঠিত এ দলের নীতি-নির্ধারকদের অন্যতম ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল দেইহিমি। এ ছাড়া ছিলেন মেজর জেনারেল হাসান আখাভী,কর্ণেল হোসেইন মানুচেহ্‌রী (যিনি পরবর্তীতে বাহ্‌রাম আড়িয়ানা নামধারণ করেন) প্রমুখ। এ দলে জেনারেল আমিন জাদেহ্, ক্যাপ্টেন ইয়াহাই, জেনারেল মাহ্‌মুদ এরাম প্রমুখও ছিলেন। বেশ কয়েকবার আমি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আরফার বাসভবনে গিয়ে দেখেছি ঐ দলের সামরিক ও বেসামরিক সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। আমি নিশ্চিত হলাম যে প্রতিদিনই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পার্টি সদস্য এখানে মিলিত হন। এ দলে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিবর্গই সদস্য ছিলেন। আরফা'র ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও শাহের অনুমোদনে এ পার্টি গঠিত হয়। আরফা সেনাবাহিনীতে তিনবার চীফ অফ স্টাফ নিযুক্ত হন এবং রাজমারার শত্রুতার কারণে পদচ্যুত হন। রাজমারা ও আরফার মধ্যে শত্রুতা কিছুকাল বিদ্যমান ছিল। রাজমারা যখনই চীফ অফ স্টাফ হয়েছেন তখন আরফা তাঁর বিরুদ্ধে এবং একইভাবে আরফা নিযুক্ত হলে রাজমারা একে অন্যকে পদচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করেছেন। এরা উভয়েই তিন তিনবার চীফ অফ স্টাফ নিযুক্ত হন।

আরফা'র দলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল কমিউনিজমের বিরুদ্ধাচরণ। এরা ব্রিটিশ সমর্থক ছিল তবে মার্কিন সমর্থক ছিলনা। অবশ্য পরবর্তীতে এ দলের কেউ কেউ মার্কিন মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠে।

www.pathagar.com

মেজর জেনারেল আরফা'র সম্পর্কে আরো কিছু বলা প্রয়োজন। আমার তুলনায় তাঁর পদমর্যাদা বেশি ছিল। আমি যখন লেফটেন্যান্ট ছিলাম তখন তিনি ছিলেন কর্ণেল। তাঁর লেখাপড়া সামরিক ভিত্তিক ছিল। তিনি সামরিক ইতিহাসের ভক্ত ছিলেন এবং এ ধরনের বই-পত্রই বেশি পড়তেন। তিনি সামরিক একাডেমীর অতিথি অধ্যাপক ছিলেন। মেজর জেনারেল আরফা ইংরেজী, ফরাসী ও রুশ ভাষায় খুবই দক্ষ ছিলেন। তাঁর পিতা আরফা-আল্- দোলেহ্ ক্বাজার আমলে দক্ষিণ ফ্রান্সে বসবাস করতেন। অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য তাঁকে রাজকুমার হিসেবে সবাই জানতো। তাঁর ছোট ভাই এবরাহিম আরফা একজন সু-শিক্ষিত সামরিক অফিসার ছিলেন। যিনি কুর্দিস্তানে সামরিক অভিযানে অংশ নেন এবং ব্যাপক সাফল্য ও প্রশংসা অর্জন করেন। পরবর্তীতে সাবেহ্ পর্ব্বতে একটি বিমান দূর্ঘটনায় তিনি মারা যান।

আরফা তাঁর সম্পূর্ণ সামরিক প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর সেন্ট্রাল কেভাল্‌র রেজিমেন্ট (জামশিদিয়েহ্ বেস) কমান্ডার নিযুক্ত হন। পদমর্যদায় তিনি একজন কর্ণেল ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি সেনাবহিনীর চীফ অফ স্টাফ নিযুক্ত হন। অত্যন্ত কর্মক্ষম হওয়ার ফলে তিনি ব্যাপক হারে অধঃস্থন অফিসারদের সমর্থন লাভ করেন। সেনা সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি আরাজ এলাকায় বিশাল কৃষি প্রকল্প গড়ে তোলেন। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের আগে তিনি তাঁর বিশাল খামারের কিছু অংশ বিক্রির মাধ্যমে বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হন।

আরফা'র সাথে আমার চমৎকার সম্পর্ক ছিল এবং যখনই তাঁর কোন সমস্যা দেখা দিত তখনই আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করতাম সমস্যা সমাধানের। আরফার স্ত্রী হিলদা ছিলেন বৃটিশ রমনী। শিক্ষিতা, সুন্দরী এবং রাজনৈতিক সচেতন হিলদা'র কূটনৈতিক মহলে প্রচুর সমাদর ছিল। আরফা-হিলদা দম্পতির একটি মেয়ে ছিল, নাম লায়লা। একজন বৃটিশ যুবকের সাথে লায়লার বিয়ে হয়। এ পুরো পরিবার বৃটিশ দূতাবাসের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতো। হিলদা'র মৃত্যুর আগেই আরফা তেহ্‌রানের উপকণ্ঠে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন।

তুদেহ্ পার্টি ও সামরিক বাহিনী ঃ

তুদেহ্ পার্টি সম্পর্কে অনেক বই লিখা হয়েছে। তাই এখানে আমি এ দল সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট উত্থাপন করতে চাই।

১। ১৯৪১ সনের সেপ্টেম্বর মাসের পর কারাবন্দী কমিউনিষ্টরা মুক্তি পেয়ে তুদেহ্ পার্টি গঠন করে। সেনাবাহিনী ও পুলিশের জি-২ রা তুদেহ্ পার্টির কার্যক্রম নিয়ে বিশেষ

www.pathagar.com

মাথা ঘামাতোনা। কিন্তু আরফা'র নেতৃত্বাধীন অনানুষ্ঠানিক সামরিক সংস্থাপনাগুলো বৃটিশ দূতাবাসের নির্দেশে তুদেহ্ পার্টির গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতো। এ অবস্থা ইরান থেকে রুশ সৈন্য প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত ছিল।

২। রুশ সৈন্যদের ইরান অভিযান এবং রাজমারা চীফ অফ স্টাফ নিযুক্ত হওয়ার পর তুদেহ্ পার্টির সদস্যদের উপর নজরদারী বিলুপ্ত হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ এমনকি স্পর্শকাতর সামরিক পদগুলোয় তুদেহ্ পার্টির সদস্যরা নিয়োগ লাভ করতে থাকে।

৩। ১৯৪৮ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি শাহ্‌কে হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তুদেহ্ পার্টিকে এর জন্য দায়ী করা হয় এবং এ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এ হত্যা প্রচেষ্টার পর জি-২'র সামরিক অফিসার ও পুলিশ কর্মকর্তারা তুদেহ্ পার্টির ব্যাপারে আবারও সতর্ক হন।

৪। মোসাদ্দেঘ-এর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে যদিও তুদেহ্ পার্টির কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু এর সদস্য সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে বাড়তে থাকে এবং এদলের সদস্যরা ততদিনে সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর পদগুলোয় প্রবেশ করে গেছে।

৫। ১৯৫৩ সনের ১৯ শে আগস্ট অভ্যুত্থানের পর তুদেহ্ পার্টির অফিসারদের সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়টি ফাঁস হয়ে পড়ে এবং অনেক অফিসারকেই গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত তুদেহ্ পার্টি সমর্থক অফিসারের সংখ্যা ছিল অনেক যাদের মধ্যে ২৬ জনকে মৃত্যুদন্ড এবং বাকীদের যাবত-জীবন মেয়াদে কারাদন্ডাদেশ প্রদত্ত হয়।

৬। পরবর্তী অধ্যায় মার্কিনীরা জি-২- কে স্বীকৃতি দান করে এবং সব সামরিক ইউনিটের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরো গঠন করে। শাহ্ বিরোধীদের বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে প্রবেশের বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা শুরু হয় এবং এ প্রচারণার মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি করা হয়। যাদেরকেই কমিউনিষ্টপন্থী হিসেবে সন্দেহ করা হয় তাদেরকে জরুরী ভিত্তিতে চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করানো হয়। সব স্পর্শকাতর পদ থেকে সন্দেহভাজন অফিসারদেরকে সরিয়ে নেয়া হয় এবং তাদের পদোন্নতি সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয় যার ফলশ্রুতিতে এদের কেউই কর্ণেল পদের উপর আর পদোন্নতি পায়নি। সামরিক বাহিনীর সর্বত্র কমিউনিষ্ট বিরোধী প্রচার ব্যাপকভাবে জোরদার করা হয়।

৭। ১৯৫৬ সনে 'সাভাক্' (রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থা) গঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিজম বিরোধী প্রচার পরিচালনা। মার্কিন তত্ত্বাবধানে সাভাক্ গঠিত হয়। ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত সাভাক্ ও জি-২-এর উপর পুরোপুরিভাবে মার্কিন প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

www.pathagar.com

আজারবাইজানের ঘটনা ঃ

আমি আগেই বলেছি বৃটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ শক্তির সাথে সম্পাদিত চুক্তিবলে তাদের সৈন্যদের যুদ্ধ শেষের ৬ মাসের মধ্যেই ইরানী ভূ-খণ্ড ত্যাগের কথা। ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্যরা ১৯৪৫ সনের শীতের মধ্যেই পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হলেও সোভিয়েত সৈন্যরা প্রত্যাহৃত হয়নি বরং আজারবাইজান প্রদেশে তাদের সেনাবাহিনীর সংখ্যা কয়েক ডিভিশন বৃদ্ধি করে। সোভিয়েত সৈন্য সংখ্যা ঠিক কত ডিভিশন ছিল তা আমাদের কাছে কোন পরিসংখ্যান যদিও ছিল না কিন্তু এর সংখ্যা কমপক্ষে ৬ ডিভিশন ছিল।

শাহ্ ইরান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার করানোর ব্যাপারে বৃটেন ও মার্কিনীদের প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতেন। তাঁর সাথে আমার প্রাত্যহিক কথাবার্তায় বুঝতে পারতাম যে মার্কিনীরা এ ব্যাপারে তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছিল। এ সময়ে তিনি মার্কিন দূতাবাসের গোয়েন্দা কর্তার সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করতেন। মার্কিনীরা তাঁকে প্রস্তাব দেয় তিনি যেন সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারে গড়িমসির বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে শাহ্ একসময়কার প্রধানমন্ত্রী ও বহু মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি হুসেইন আ'লাকে জাতিসংঘে পাঠান।

হুসেইন আ'লা একজন চৌকষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার ইংরেজি ও ফরাসীর ভাষায় অসাধারণ দক্ষতা ছিল।

যাইহোক, মার্কিন প্রতিনিধিরা জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি প্রচন্ড চাপ প্রয়োগ করে এবং সোভিয়েতদেরকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলে যদি তারা ইরান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার না করে নেয় তবে এর ফলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধতে পারে এবং সে যুদ্ধে অবশ্যই মার্কিনীরা জয়ী হবে। মার্কিন হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৪৬ সনে ইরান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু সোভিয়েতেরা আজারবাইজানে তাদের পুতুল সরকারকেই রেখে যায়।

ইরান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার শাহের মনে একপ্রকার মার্কিন অনুরক্ততার জন্ম দেয়। একদিন তিনি আমাকে বলেন. "মার্কিনীরা কি দারুণ শক্তিধর। তাদের উপর আস্থা রাখাতেই আজারবাইজানকে সোভিয়েত মুষ্টি থেকে রক্ষা করা গেছে। মার্কিনীদের প্রতি শাহ্ প্রচন্ডভাবে কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েন এবং এর নিদর্শন স্বরূপ ১৯৪৯ সনে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে যান সে দেশের সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে। আজারবাইজান সমস্যা শাহ্কে ক্ষমতাধর মার্কিনীদের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয় যদিও তিনি বৃটিশদের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখেন।

www.pathagar.com

শাহের বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র সফর ঃ

১৯৪৮ সনে বৃটেন, ফ্রান্স, সুইজ্যারল্যান্ড ও ইতালী সফর শাহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শাহ্ ব্যক্তিগতভাবে কখনোই পশ্চিমা বিশ্বের আমন্ত্রণ উপেক্ষা অথবা প্রত্যাখ্যান করতেন না। তিনি ফরাসী ভাষায় অত্যন্ত সাবলীল এবং ইংরেজিতেও পারদর্শী ছিলেন এবং পশ্চিমা দেশগুলো ভ্রমণের সময় এ দু'টো ভাষা জানা থাকার ফলে তিনি পশ্চিমাদের সাথে সহজেই মিশতে পারতেন ও মনের ভাবাবেগ আদান-প্রদান করতে পারতেন।

বৃটেন সফর হয় ইংল্যাণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জের আমন্ত্রণে। ইংল্যাণ্ডে দু'দিন অবস্থানকালে শাহ্‌কে পর্যাপ্ত আতিথেয়তা ও সমাদর প্রদর্শন করা হয়। ইংল্যাণ্ড সফরকালে শাহের সম্মানে একাধিক ভোজের আয়োজন করা হয় এবং বৃটেনের রাজপরিবার শাহের ভ্রমণের শেষ দিনে তাঁকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যান। শাহের সঙ্গী হিসেবে অন্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে আমিও থিয়েটারে যাই।

ইংল্যাণ্ড সফর শেষে আমরা ফ্রান্স অভিমুখে রওয়ানা হই। সেখানে আমরা একটি অভিজাত ও বিলাশবহুল হোটেলে অবস্থান করি। ফ্রান্স থেকে আমরা যাই সুইজ্যারল্যাণ্ডে। সুইস কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট আমাদেরকে তাঁর রাজ প্রাসাদে এক নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানান। প্রাসাদটি খুবই সাধারণ একটা বাড়ি যেটি একজন বৃদ্ধা মহিলা রাষ্ট্রকে দান করেছেন। এ সাধারণ বাড়িটিকেই সুইস কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ ও দফতরে রূপান্তরিত করা হয়। বাড়িটিতে সামান্য কয়েকটি কক্ষ ছিল এবং সবচেয়ে বড় কক্ষটি হলো খাবার ঘর যেখানে বড় জোর ২০ জন লোককে একত্রে আপ্যায়িত করা যায়। গোল খাবার টেবিলে অতিথিদেরকে বসানো হয়। সুইস প্রথানুসারে গোল টেবিল ব্যবহারের কারণ হলো যাতে আমন্ত্রিত সব অতিথিই সমানভাবে সম্মানিত বোধ করতে পারেন। প্রাসাদের আসবাব পত্রের মধ্যেও অনেকগুলোই বাড়িটির পূর্বতন মালিক বৃদ্ধা মহিলার রেখে যাওয়া। খাবার ঘরটা অনেকটা করিডোরের মতো দেখতে এবং এতে কোন বাড়তি সাজ-সজ্জাও নেই। সুইস মন্ত্রীদের জীবন যাপন পদ্ধতি আমাদেরকে দারুণভাবে অভিভূত করে। মন্ত্রীদের অনেকেই বাইসাইকেলে চলাচল করতেন। তবে পথচারীরা মন্ত্রীদেরকে খুবই সম্মান করতো। সুইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এক ইতালীও ভাষাভাষী এবং অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি। সুইস কনফেডারেশন প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর মন্ত্রীদের অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন এবং তাঁদের প্রতি দেশের নাগরিকদের অগাধ ভালবাসার বিষয়টি আমার মনকে দারুণভাবে নাড়া দেয় এবং আজও এটি আমার স্মৃতিতে উজ্জল হয়ে আছে।

www.pathagar.com

শাহের সফর সঙ্গী হিসেবে পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৪৯ সনে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাই। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে শাহ্ এ সফরে যান। মার্কিনীরা শাহ্কে ব্যাপকভাবে সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করে এবং তাঁর সম্মানে একাধিক বিশাল ভোজসভার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে আমার স্মৃতিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মার্কিন সেনা জেনারেল নেলসন ব্রেডলি'র দেয়া নৈশভোজ। মার্কিন ও ইরানী সেনা অফিসারদের সকলেই সামরিক পোশাকে নৈশভোজে অংশ নেন। নৈশভোজ অনুষ্ঠান চলাকালে জেনারেল নেলসন ব্রেডলি আমার সাথে করমর্দন করে প্রশ্ন করেন "তুমি কি আমাকে চেন?" জবাবে আমি তাঁকে স্যালুট করে বললাম নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, "আমিও তোমার সম্পর্কে জানি এবং নতুন করে আমার কাছে তোমার পরিচয় দেয়ার দরকার নেই"। তিনি বললেন, "আমি চাই তুমি আমাদের একটা জরুরী বিষয় নিয়ে শাহ্র সাথে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে কথা বলো। সেটি হলো, শাহ্ চান আমরা যেন রুশরা কোন কারণে ইরান আক্রমণ করলে মার্কিন সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে ইরানকে রুশদের হটাতে সহায়তা করি। কিন্তু ইরানের ক্ষেত্রে এটা আমাদের জন্য সম্ভব হবে না কারণ, ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধার ফলে রুশরা সামান্যতম সময়ের মধ্যেই সেখানে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে পারবে অথচ মার্কিন সৈন্যদের সেখানে পৌঁছাতে ১৫ থেকে ২০ দিন সময় লাগবে। তাও আবার বড়জোর ২ ডিভিশন সৈন্য পৌঁছানো যেতে পারে। আগামীকাল আমাদের যৌথ বৈঠক, তাই আমি চাই আজ রাতেই শাহ্কে খুব সুন্দরভাবে ব্যাপারটা বোঝানো হোক যাতে তিনি ক্ষুব্ধ না হন এবং আগামীকালের বৈঠকের সময় তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। আমাদের পরামর্শ হলো, কোন কারণে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো রুশরা আক্রমণ করলে ইরানি সৈন্যরা যেন যাগরোস পর্বতমালায় পিছু হটে যায়। আর ৩/৪ শ কিলোমিটার বিস্তৃত এ যাগরোস পর্বতমালাতেই ইরানী সেনা বাহিনীর মূল ঘাটি গড়ে তোলা উচিৎ। এমনটি হলে মার্কিন সৈন্যরা বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যদিয়ে ইরানে প্রবেশ করে ইরানী সেনাবাহিনীর শক্তি বাড়াবে। আর এভাবেই ইরানের সীমান্ত প্রতিরক্ষা নিশ্চিত হবে। শাহ্ হয়তো প্রাথমিকভাবে ব্যাপারটা মানতে চাইবেন না কিন্তু ইরানের সীমান্ত প্রতিরক্ষার স্বার্থে এর চেয়ে কার্যকর পদ্ধতি আর একটিও নেই"।

আমি ভাবলাম এমন জটিল বিষয় নিয়ে শাহের সাথে আলাপ করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত। কিন্তু জেনারেল ব্রেডলি'র পরামর্শে আমি ব্যাপারটাতে রাজী হলাম এবং রাতের ভোজ থেকে ফিরে এসেই শাহ্কে এ বিষয়টা জানালাম। শাহ্ বললেন, "ইরানী সৈন্যরা প্রতিরক্ষার স্বার্থে পিছু হটবে এটাতো কোন অবস্থাতেই সম্মানজনক নয়। যাইহোক আমি

www.pathagar.com

ব্যাপারটা ভেবে দেখবো এবং আগামীকালের বৈঠকে পেন্টাগণের সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করবো"। আমাকে অবশ্য এ বিষয়ে শাহ্ আর কিছুই বলেননি কিন্তু মার্কিন অফিসাররা পরে এ বিষয়টা শাহ্‌র কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য ধন্যবাদ জানান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পরামর্শকদের প্রদর্শিত পন্থায় পরবর্তীতে যাগরোস এলাকায় ইরানী সেনাবাহিনীর দুই-তৃতীয়াংশকে মোতায়েন করা হয়। বাকী সৈন্যদের ইরানের অন্যান্য অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়।

রাযমারা এবং শাহ্ ঃ

লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাজিয়ালী রাযমারা ইরানী সেনাবাহিনীর একজন অত্যন্ত চৌকষ এবং সু-শিক্ষিত জেনারেল ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নের সময় তিনি ইরানের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে ১২ খন্ডে যে বইটি লিখেন সেটি ইরানের সামরিক ভূগোল নামে প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত উচ্চাভিলাসী এ জেনারেল দারুণ সাহসী ছিলেন। অসম্ভব বলে কোন শব্দ সম্ভবত তাঁর ব্যক্তিগত অভিধানে ছিল না। প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী জেনারেল রাযমারা (যিনি পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হোন) সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত তড়িৎ ও দৃঢ় ছিলেন। তিনি কখনোই সিদ্ধান্ত গ্রহণে দোটানায় ভুগতেন না। তবে আমার মনে হয় সু-শিক্ষিত রাযমারা'র ইরান, মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ছিল। তিনি অনেক সময়ই ধৈর্যহীনতায় ভুগতেন। আরেকটি নেতিবাচক দিক হলো তিনি তাঁর স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও পরিকল্পনাকেই চূড়ান্ত জ্ঞান করতেন এবং কারুর কথাই শোনতেন না। তবে রাযমারাকে দূর্নীতিপরায়ণ বলা যায় না। যদিও তিনি তাঁর স্বীয় কর্তৃত্বে নতি স্বীকারকারী সেনা অফিসারদের দূর্নীতির বিষয়গুলোকে অত্যন্ত কৌশলের সাহায্যে এড়িয়ে যেতেন।

১৯৪১ সালের পর রাযমারা তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছতে সক্ষম হন এবং সেনাবাহিনী প্রধানের পদে উন্নিত হন। এ পদে উন্নিত হতে তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দী মেজর জেনারেল আরফা'র সেনাপ্রধান হওয়ার সম্ভাবনাকে অত্যন্ত সুক্ষতা ও চাতুর্যতার মাধ্যমে গুড়িয়ে দিতে সক্ষম হন জেনারেল রাযমারা। জেনারেল আরফা'র সাথে সেনাপ্রধান পদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দীতায় বিজয়ী হওয়ার অন্যতম কারণ হলো রাযমারার পেছনে বিদেশী সমর্থন। তিনি বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে কর্মরত কুটনীতিকদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং প্রায়শই তার বাসভবনে এদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপ্যায়িত করতেন।

সেনাপ্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রাযমারার পরবর্তী লক্ষ্য হয় প্রধানমন্ত্রীত্ব। তার স্বভাবসূলভ চাতুর্যতা আর কৌশলের মাধ্যমে তিনি এ পদ প্রাপ্তির পথও প্রায় পরিষ্কার

www.pathagar.com

করে ফেলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়ান হাজের। হাজের ছিলেন একজন বৃটিশদের এজেন্ট। হাজের অবশ্য খুব দ্রুত প্রধানমন্ত্রী ও রাজ কোর্টের মন্ত্রী পদে উন্নতি লাভ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীত্বের পদের প্রতি রাযমারা আগ্রহী হওয়ার পর হাজের নিহত হলে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করে যে এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে রাযমারা'র হাত আছে। কিন্তু পরবর্তীতে এ বিষয়ে যথাযথ তদন্ত করার জন্য আমার নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় সেখানে হাজের হত্যাকাণ্ডের পেছনে রাযমারা'র জড়িত থাকার বিষয় মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়।

রাযমারা সম্পর্কে আরেকবার অভিযোগ উত্থাপিত হয় ১৯৪৮ সনে শাহ্‌কে হত্যা প্রচেষ্টার পেছনে জড়িত থাকার ব্যাপারে। ১৯৪৮ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি আমি এবং পেরন শাহ্‌র প্রাসাদে অপেক্ষা করছিলাম। সেদিন ইরানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে একটা অনুষ্ঠানে শাহ্ যোগ দেন। শাহের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল পারমানেন্ট গাইড ও বিশেষ শাখার সদস্যরা। শাহের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিশ্বস্ত লোক মেজর জেনারেল দাফতারী ছিলেন শাহের পাশের সিটে এবং তার দায়িত্ব ছিল শাহের নিরাপত্তা প্রধানের। শাহ্ গাড়ী থেকে নেমে আইন অনুষদে প্রবেশ করতে গেলেই আততায়ীর বন্দুক থেকে ৫ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়। যদিও সবকটি বুলেটই শাহের গায়ে লাগে কিন্তু তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে স্থান ত্যাগ করে প্রাণ রক্ষায় সক্ষম হন। আততায়ীর বন্দুকের গুলি শেষ হয়ে গেলে তাকে শাহের নিরাপত্তা কর্মীরা ধাওয়া করে ধরে ফেলে এবং জেনারেল দাফতারী খুব কাছে থেকে গুলি করে আততায়ীকে হত্যা করেন।

শাহের প্রাসাদে অপেক্ষমান থাকা অবস্থায় আমাদের কাছে দূর্ঘটনার খবর পৌছুলে আমি ও পেরন দ্রুত ইউসুফ আবাদস্থ ১ নম্বর সামরিক হাসপাতালে ছুটে যাই। শাহ্ একটা কক্ষের কোণে চেয়ারে বসে ছিলেন এবং সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তারা সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে ছিলেন। সামরিক চিকিৎসক ব্রিগেডিয়ার নাখাফ আবাদী শাহের চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি জানালেন যে বুলেটের আঘাতগুলো মারাত্মক নয় তাই শাহের কোন অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে না। আমরা শাহের কাছে গিয়ে আমাদের সমবেদনা জানালাম। তিনি আমাদের সমবেদনার জবাবে মাথা নাড়ালেন। চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ব্যান্ডেজ সারার পর শাহ্ প্রাসাদে ফিরে গেলেন। আমি এবং পেরন শাহের সাথেই গেলাম এবং সাড়া রাত তাঁর শয্যার পাশেই অবস্থান করলাম। প্রতি ঘন্টায় চিকিৎসকরা এসে শাহকে দেখে যাচ্ছিলেন।

শাহের উপর হত্যা প্রচেষ্টার তুদেহ্ পার্টি ও আয়াতুল্লাহ কাশানীর নাম শোনা গেল। এর পেছনে রাযমারা'র হাত আছে বলেও সন্দেহ করা হলো। শাহ্ এ ব্যাপারে রাযমারাকে

www.pathagar.com

পরোক্ষাভাবে প্রশ্নও করেছিলেন। ইরানের রাজ সেনাবাহিনীর জি-২ অফিসার মোবাশ্বের আমাকে বলেন যে তিনি রাযমারা'র ব্যক্তিগত ডাইরীতে দেখতে পেয়েছেন যে ৪ঠা ফেব্রুয়ারির ঘটনার সাথে তার জড়িত থাকার ইঙ্গিত রয়েছে। এ ডাইরীটি মোবাশ্বের জব্দ করেন। আমি ডাইরীটি চাইলে তিনি বলেন এটি শাহের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আমি অবশ্য কখনোই শাহ্‌কে ডাইরীর ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করিনি কিন্তু পরবর্তীতে তিনি একাধিকবার আমার কাছে বলেছেন, "রাযমারা একটা ভয়ংকর শয়তান"। শাহের এ মন্তব্যে আমার কাছে পরিস্কার হয়েছে যে মোবাশ্বের যে ডাইরীটি শাহের কাছে হস্তান্তর করেন সেটিতে রাযমারা নিশ্চিতভাবে এমন কিছু উল্লেখ করেছেন যাতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারির ঘটনার সাথে তার সম্পৃক্ততার ইংগিত পাওয়া গেছে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারির ঘটনায় শাহ যদি নিহত হতেন তবে রাযমারাই দেশের শাসনভার গ্রহণে সক্ষম হতেন। কারণ সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনী তার নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং শাহের কোন উত্তরাধিকারী ছিলনা। বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের পেছনে রাযমারার হাত ছিল বলে সন্দেহ করা হলেও শাহ্ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন নি। কারণ, মার্কিন, বৃটিশ ও সোভিয়েতদের সাথে রাযমারার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রাযমারা নিয়মিতভাবে এসব দেশের রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য কূনীতিকদের তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতেন ও বৈঠক করতেন। শাহের নির্দেশে রাযমারার গতিবিধির উপর অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো।

যাইহোক ১৯৫০ সনে রাযমারা শাহ্ মসজিদের একটি জানাজায় অংশ নিতে গেলে"ফাদ্বাইন ইসলাম" সংগঠনের হাতে নিহত হন।

শাহ্ এবং মোসাদ্দেঘ ঃ

১৯৪৭ সনে আমি প্রথম পেট্রোলিয়াম শিল্পগুলোর জাতীয়করণের খবর শুনি। কিরমান শাহ্ অঞ্চলের অত্যন্ত বিত্তবান বনেদী পরিবার যাংগিনেহ্‌দের কাছ থেকে প্রথম পেট্রোলিয়াম শিল্পটি জাতীয়করণ করা হয়। যাংগিনেহ্ পরিবারে একজন সদস্য যিনি সংসদ সদস্য ছিলেন এবং নিয়মিত রাজ কোর্টে যাতায়াত করতেন, তার সাথে আমার ভাল সম্পর্ক ছিল। আমি যেহেতু তাকে সমর্থন করতাম তাই তিনিও আমার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। যাংগিনেহ্‌র সাথে বৃটিশ দূতাবাসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তিনি তাদের খুবই বিশ্বস্ত এজেন্ট ছিলেন। একদিন যাংগিনেহ্ আমাকে বললেন যে, মার্কিনীরা চায় পেট্রোলিয়াম শিল্প জাতীয়করণ করা হোক এবং এ লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করে এর স্বপক্ষে জনমত গড়ার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

www.pathagar.com

যাইহোক ১৯৪৯ সনের অক্টোবর থেকে মোসাদ্দেঘের নেতৃত্বে কয়েকজন এম পি প্রায় ১০০০ লোকসহ মার্বেল প্রাসাদের সামনে অবস্থান নেয়। আমি জানতাম এদের এ পদক্ষেপের পেছনে মার্কিন দূতাবাসের ঘনিষ্ঠ এবং শক্তিশালী মদদ রয়েছে। শাহ্ আমার উপর দায়িত্ব দিলেন ঘটনাগুলো পরিদর্শন করে এ বিষয়ে তাঁকে রিপোর্ট করতে। এছাড়াও তিনি আমাকে নির্দেশ দেন মোসাদ্দেঘের সাথে কথা বলে তাদের দাবী সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হতে। আমি মোসাদ্দেঘের কাছে গিয়ে আমার পরিচয় দিয়ে বললাম শাহ্ আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর (মোসাদ্দেঘের) সাথে কথা বলে তাদের দাবীর বিষয়ে জানতে। মোসাদ্দেঘ বললেন, "আমরা প্রাসাদে অবস্থান ধর্মঘট করতে চাই"। আমি বললাম সবাই। তিনি বললেন "না গোটা এক হাজার সদস্যের দল নয়, বরং "কুড়ি জন"। তিনি আমাকে আরো জানালেন যে, তাদের অবস্থান ধর্মঘটের দাবী না মেনে নিলে তারা চৌরাস্তার উপর অবস্থান নেবেন। আমি এ খবর শাহের কাছে পৌছালে তিনি বললেন, "এদেরকে রাস্তার উপর অবস্থান নিতে দেয়াটা ঠিক হবেনা"। তিনি কোর্ট মন্ত্রী হাজেরকে নির্দেশ দিলেন প্রাসাদের অভ্যন্তরে মোসাদ্দেঘ ও তাঁর সঙ্গীদের অবস্থান করার মত কামরা তৈরি রাখতে। রাজ প্রাসাদের পাচকদের উপর দায়িত্ব দেয়া হলো এসব অবস্থানকারীদের আতিথেয়তা প্রদানের। আমি মোসাদ্দেঘকে শাহের পক্ষে প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানালাম। মোসাদ্দেঘ ও তাঁর সঙ্গীরা প্রাসাদের অভ্যন্তরের একটি স্থানে অবস্থান নিলেন এবং প্রথম রাতটা মোসাদ্দেঘ প্রাসাদেই থাকলেন। পরবর্তী দিন সকালে তিনি শাহের সাথে দেখা করলেন আর এভাবেই তিনি পেট্রোলিয়াম শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ আন্দোলনের নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেন।

রাযমারা'র প্রধানমন্ত্রীত্বকালে পেট্রোলিয়াম শিল্পের জাতীয়করণ বিল পার্লামেন্টে উত্থাপিত হলে রাযমারা মন্ত্রী পরিষদ-এর ঘোর বিরোধিতা করেন।

১৯৫১ সনে মোসাদ্দেঘ প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভে সক্ষম হন যার পেছনে মূলত পেট্রোলিয়াম শিল্পের জাতীয়করণ আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব মূখ্য ভুমিকা রাখে। আমার মনে হয় মোসাদ্দেঘ তাঁর যুব বয়স থেকেই বৃটিশদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হন।

মোসাদ্দেঘ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর শাহের জন্য কঠিন সময় শুরু হয়। মোসাদ্দেঘ তার প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য একবার শাহের সাথে দেখা করেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রথম মাসে তিনি মাত্র কয়েকবার শাহের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হলেও পরবর্তীতে অসুস্থতার অজুহাতে তিনি শাহের সাথে দেখা করা প্রায় বন্ধ করে দেন। ধীরে ধীরে মোসাদ্দেঘ তার আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন এবং সেনাবাহিনীর উপর শাহের কর্তৃত্ব

www.pathagar.com

মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। শাহ্ কেবল সেনাদের উদ্দেশ্যে জারিকৃত আদেশ সই করতে পারতেন যখন এগুলো মোসাদ্দেঘ অনুমোদন করে দিতেন। এমনকি অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেঘ সরাসরি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে আদেশ জারির নির্দেশ দিতেন। আর এর ফলে ইরানের রাজনীতিতে মোসাদ্দেঘ এক নম্বর ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হন। মোসাদ্দেঘের তিন বছর শাসনকালে তিনি শুধু নিজেই শাহের সাথে দেখা করাকে উপেক্ষা করেননি বরং তার মন্ত্রী পরিষদ বিশেষ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রিয়াসীকেও নির্দেশ দেন শাহের সাথে দেখা করাকে এড়িয়ে যেতে। মোসাদ্দেঘ প্রধানমন্ত্রীত্বের তিন বছরের প্রথম বছরের সেপ্টেম্বর নাগাদ আমি ইরানে ছিলাম। ১৯৫২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আইন বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের জন্য আমি প্যারিস চলে যাই। প্যারিসে অবস্থানকালে আমি জানতে পারি যে শাহ্ পরিবারও প্যারিসে আছেন। আমি তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। তারা একটা মাঝারী মানের হোটেলে অবস্থান করছিলেন। রাজমাতা, শামস্, আশরাফ ও শাহ্নাজ হোটেলে অবস্থান করছিলেন। প্যারিসে অবস্থানরত ইরানী রাষ্ট্রদূত বা ঐ দূতাবাসের কোন পদস্থ কূটনীতিক ফ্রান্সের হোটেলে অবস্থানরত শাহ্ পরিবারের সাথে দেখা করেননি বা তাদের খোঁজ-খবরও নেননি। কারণ মোসাদ্দেঘ সমর্থক রাষ্ট্রদূত চাইতেন না দূতাবাসে কর্মরত কূটনীতিকরা শাহ্ পরিবারের সাথে যোগাযোগ করুক। ইরান দূতাবাসের একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী শাহ্ পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। এ কর্মচারীর নাম যাজায়েরী। রাজমাতা ও শাহ্ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ধারণা ছিল যে যাজায়েরী শাহ্ পরিবারের একজন ভক্ত। একদা হোটেলে যাজায়েরীর সাথে আমার দেখা হয়েছে এবং তাকে দেখে খুব ধূর্ত লোক বলেই মনে হয়েছে। সে তার কার্যদিবসের কার্যসময়েই বেশির ভাগ হোটেল কক্ষে আসতো আর এতে আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি যে মূলত সে ছিল রাষ্ট্রদূত কর্তৃক নিয়োগকৃত তথ্য সংগ্রহকারী।

ফ্রান্সে অবস্থানরত শাহ্ পরিবার আমাকে জানান যে প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেঘের যেকোন ধরনের হয়রানীমূলক পদক্ষেপের হাত থেকে রক্ষা পেতে তারা আপাতত ফ্রান্সেই অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও এ অবস্থানকালে আশরাফ বেশ কয়েকবার ইরান সফর করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেঘ রাষ্ট্রের উপর তার ব্যাপক কর্তৃত্ব বিস্তার করেন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যায়ের বিষয়গুলো তার প্রত্যক্ষ অনুমোদন ছাড়া সম্ভব ছিলনা। শাহের পরিবারের কিছু ঘনিষ্ঠ সদস্য ও তাদের আস্থাভাজন কিছু কর্মকর্তারা রাজকোষ থেকে মাসিক ভাতা

www.pathagar.com

পেতেন। আমি নিজেও প্রতিমাসে ৫০০ টোমান গ্রহণ করতাম। কিন্তু মোসাদ্দেঘ এ অর্থ প্রদান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন। এমনকি তিনি শাহের ভোজন খাত খরচও ব্যাপকভাবে হ্রাস করে দেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মোসাদ্দেঘের তিন বছর শাসনামলে শাহ্ চূড়ান্ত ধৈর্য্যের পরিচয় দেন।

মোসাদ্দেঘের অপসারণ ও স্বৈর শাসন ঃ

১৯৫২ সনের ১৫ আগস্ট শাহ্ দুটি ফরমান জারি করেন। একটি হলো মোসাদ্দেঘের অপসারণ এবং অপরটি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাহেদীর নিয়োগ। এ আকস্মিক 'অভ্যুত্থানের' পেছনে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্টের মদদ ছিল। এ আদেশ জারির সময় দু'টি সম্ভাবনা দেখা দেয়। মোসাদ্দেঘ যদি এ আদেশ মেনে নেন তবে জাহেদী শান্তিপূর্ণভাবে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হবেন। কিন্তু যদি তিনি তা না করেন তবে একমাত্র সংঘাতের মাধ্যমেই এ পরিবর্তন সম্ভব হবে।

মোসাদ্দেঘকে অপসারণের জন্য জাহেদী'র নেতৃত্বে তিনটি সেনা গ্রুপ তৈরি রাখা হয়। প্রথম গ্রুপের দায়িত্ব মোসাদ্দেঘের বাসভবন ঘেরাও করা ও তাকে গ্রেফতার করা। দ্বিতীয় গ্রুপের দায়িত্ব রেডিও স্টেশন দখল এবং তৃতীয় গ্রুপের কাজ হলো প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া। কিন্তু মোসাদ্দেঘের কাছে যে অফিসার শাহের আদেশটি নিয়ে যান তাঁকে মোসাদ্দেঘের নির্দেশে গ্রেফতার করা হয়। মোসাদ্দেঘের প্রতি অনুগত প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রিয়াহী, বিমান বাহিনীর কমান্ডার মেজর জেনালের শাহাপার এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আমিনী'র নেতৃত্বে মোসাদ্দেঘ বিরোধী বাহিনীকে নিরস্ত্র ও পরাস্ত করা হয়। শাহ্, তাঁর পত্নী ও কয়েকজন সেনা অফিসারসহ নওশেহ্র এলাকায় অপেক্ষা করছিলেন বরখাস্ত আদেশে মোসাদ্দেঘের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য। ১৯-শে আগস্ট সকালে মোসাদ্দেঘকে অপসারণের উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার খবর শাহ্র কাছে পৌঁছলে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা বাগদাদে পালিয়ে যান। বাগদাদ বিমান বন্দর থেকে প্রয়োজনীয় জ্বালানী সংগ্রহ করে শাহ্ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে বহনকারী বিমান রোমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। রোমে এক্সেলসিওর হোটেলে অবস্থানকালে শাহ্ বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ করেন। মার্কিন ও ব্রিটিশদেরকে বোঝানো হয় যে মোসাদ্দেঘের নেতৃত্বাধীন সরকার ইরানকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত করবে। শাহের অনুরোধে ও ইরানে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শাহ্কে ইরানে প্রত্যাবর্তন করে মোসাদ্দেঘকে অপসারণ পরিকল্পনায় অংশ নেয়ার অনুরোধ জানালে শাহ্ তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নিরাপত্তার

www.pathagar.com

কথা বিবেচনা করে ইরান প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে। মার্কিনীদেরকে অনুরোধ জানান একজন যোগ্য অফিসার প্রেরণের জন্য যার নেতৃত্বে মোসাদ্দেঘ সরকারকে অপসারণ করা যাবে। মোসাদ্দেঘকে অপসারণের জন্য মার্কিনীরা জাহেদী'র মাধ্যমে ৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে বলে শোনা যায়। অবশ্য যাহেদী এ অর্থে সামান্য অংশ খরচ করেন এবং সিংহভাগই পকেটস্থ করেন।

মার্কিনীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোসাদ্দেঘ সরকার অপসারিত হয়। যাহেদী ইরানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শাহ্ ইরানে প্রত্যাবর্তন করেন। যাহেদী ও শাহের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারীর দায়িত্বে নিয়োজিত হন আসাদোল্লাহ আলম। তিনি প্রতিদিন সকালে শাহের সাথে দেখা করে তাঁর আদেশ ও মতামত যাহেদী'র কাছে পৌঁছে দিতেন। কিছুদিনের মধ্যেই একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠে যে যাহেদীও ধীরে ধীরে শাহকে অবজ্ঞা করতে থাকেন। কিন্তু আসাদোল্লাহ্ আলম বৃটিশ ও মার্কিনীদেরকে বোঝাতে থাকেন যাতে যাহেদীকেও অপসারণ করা হয়। আমার মতে, ইরানে শাহ্ স্বৈরতন্ত্র কায়েমসহ যাহেদী সরকারের অপসারণের পেছনে আসাদোল্লাহ আলম ব্যাপক ভুমিকা পালন করেন। যাইহোক, মোসাদ্দেঘকে অপসারণের জন্য সংঘঠিত অভ্যুত্থানের দেড় বছরের মাথায় যাহেদীকে জেনেভায় ইরানের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে তাঁকে পক্ষান্তরে ইরানের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

পেরনের জীবন এবং মৃত্যু ঃ

বৃটিশরা ইরানে কাজাক সেনা অফিসারদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে যখন রুশ অফিসারদের নেতৃত্বে এরা ইরানে ছিল। তাদের মধ্যে আমির মোভাসাঘ নাখজাভান (যিনি আমিরটোমান বা মেজর জেনারেল ছিলেন) এবং রেজা খাঁন (যিনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বা মীরপাঞ্জ ছিলেন) কে নির্বাচিত করে পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ ও যাচাইয়ের পর রেজা খাঁনকে বিশেষ দায়িত্বে ব্যবহার করা হয়। এ অফিসারদের রেজা শাহ্ তার স্ত্রীগণ, সন্তানগণ এবং সহযোগীগণের উপর ব্যাপক আধিপত্য ছিল। তাদের সংস্পর্শে যারাই আসতো তাদের উপর এ অফিসারদ্বয় দারুণ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হতেন। রেজা শাহ্'র শাসনামলে এদের আধিপত্যের ব্যাপারটা খোলাখুলিই ছিল এবং রেজা শাহ্ নিজেও এদেরকে দারুণ শ্রদ্ধা করতেন।

রেজা শাহ্র বিশেষ ভৃত্য সোলায়মান বেহ্বুদি ছাড়া মিসেস আরফা, যিনি শাহের সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই ছিলেন। তিনি সরাসরি অথবা তার পরিবারের মাধ্যমে বৃটিশদেরকে নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করতেন। বৃটিশরা মিসেস আরফাকে তথ্য সংগ্রহের মোক্ষম

www.pathagar.com

হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতো। কারণ তিনি ছিলেন শাহের তত্ত্বাবধায়ক এবং তার অবস্থান ছিল খুবই স্পর্শকাতর। মিসেস আরফাকে শাহের জীবনে বৃটিশরাই স্থাপন করে। আমার অবস্থান সম্পর্কেও বৃটিশরা পুরোদস্তুর অবগত ছিল আর তাই আমার ব্যাপারেও তারা পৃথক একটা ফাইল খুলেছিল। তারা আমাকে তাদের জন্য একটা চমৎকার মাধ্যম মনে করতো কারণ আমার অবস্থান ছিল চমৎকার এবং আমার সাথে শাহ্ পরিবারের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকতো।

লে-রোসেতে পড়ার সময় সে স্কুলের প্রিন্সিপালের স্ত্রী ছিলেন একজন মার্কিনী। এছাড়া তার দু'জন বৃটিশ মহিলা সহকারী ছিল। বৃটিশদের জন্য লে-রোসে স্কুলটা ছিল খুবই আগ্রহের কেন্দ্র কারণ এখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সন্তানরা অধ্যায়ন করতো, যাদের মধ্যে ভারতের মহারাজা অথবা মার্কিন বিলিয়োনিয়ারদের সন্তানরাও ছিল। এ স্কুলের ছাত্রদের মাঝে মাত্র একজন ছিল সুইস। সুইসরা এ স্কুলে তাদের সন্তানদের পাঠাতো না, কারণ এটি ছিল যথেষ্ট ব্যয়বহুল। এক বছরের শুধুমাত্র স্কুল বেতন ছিল ২৪০০ সুইস ফ্রাংক যা ১৯৩১ সনের জন্য যথেষ্ট ব্যয়বহুল। এ ব্যাপক ব্যয়বহুলতার কারণে সব শিক্ষার্থীর পক্ষে এখানে পড়াশোনা করা ছিল অসম্ভব। যাইহোক লে-রোসেতে শাহ্ আসার তিন মাস আগে থেকেই পেরনকে বৃটিশরা সেখানে "স্থাপন" করে। পেরন সে স্কুলের কর্মচারী হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে থাকে। পেরন ভৃত্যদের পোশাক পড়ে রান্নাঘরে কাজ করতো। সে খুব সহজেই শাহ্'র মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়। পেরন শাহ্কে নিয়ে কবিতা লেখতো এবং সেগুলো চম ৎকারভাবে আবৃতি করে শোনাতো। সে আমারও খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়। এতে সন্দেহ নেই যে সে শাহ্ এবং আমার ব্যাপারে বৃটিশদের নিয়মিত খবর পৌছাতো আর যেহেতু আমার সাথে শাহ্'র সম্পর্ক ছিল চমৎকার তাই পেরন কখনো আমার সাথে কোন বিরোধে জড়াতো না। পেরন ক্রমশ বৃটিশদের কাছে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

ইরানে ফিরে আসার পর পেরনের সাথে আমার এবং শাহের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়। পেরন আমার প্রতি বিদ্বেষসুলভতো ছিলোই না বরং সে আমাকে প্রায়শই বলতো "আপনি আমার বস্। আমার কোন আচরণ যদি আপনার ভাল না লাগে তবে খোলাখুলি ভাবেই বলবেন। এতেই আমি নিজেকে সংশোধিত করে নেব।" সে সর্বদাই আমাকে সন্তুষ্ট রাখতে চাইতো যদিও আমার কাছ থেকে তার কোন ধরনের অনুমোদন নেয়ার দরকার ছিলনা। আসলে পেরনের ব্যবহারটাই ছিল এমন। আমার মতোই শাহের সাথেও

www.pathagar.com

পেরনের সম্পর্ক ছিল খুবই খোলাখুলি আর ঘনিষ্ঠ। সে যা কিছুই চাইতো তা শাহ্ অবশ্যই পূর্ণ করতেন এবং শাহ্ পেরনের মতামত ও সিদ্ধান্তকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। একবার শাহের সাথে পেরনের মতপার্থক্য হওয়ায় শাহ্ পেরনের প্রতি দারুণ ক্ষুব্ধ হন। এমনকি তাদের মধ্যে কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দু'দিনের মধ্যেই আমার মধ্যস্থতায় সে সম্পর্ক আবার স্বাভাবিকতা লাভ করে।

এ সময়ে পেরন বৃটিশ, সুইস এবং ফরাসী দূতাবাসের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে থাকে। সে আমার ও শাহ্'র সাথে সুস্পষ্টভাবে বৃটিশদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের বিষয় আলাপ করতো। সাধারণত সে আমার কাছে বিস্তারিতভাবে বলতো যাতে আমি তা শাহ্'র সাথে আলাপ করি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পেরন আমাকে বলতো, "আমি বৃটিশ দূতাবাসে গিয়েছিলাম এবং তাদের অভিমত হলো এ রকম যেটা গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন আছে। এটাই তাদের অবস্থান, শাহ্কে ব্যাপারটা জানাবেন। কোন সময় আমি যখন শাহ্কে বৃটিশ দুতাবাসের দৃষ্টিভঙ্গির কথা, যা পেরনের মাধ্যমে আসতো, জানাতাম তখন শাহ্ এগুলো নেতিবাচকভাবে নিতেন কিন্তু চূড়ান্তভাবে তিনি তা মেনে নিতেন। এমনো হতো যদি শাহ্ পেরনের প্রস্তাব না মানতেন তবে পেরনও শাহের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে বলতো,"বৃটিশদের মতামতে আপনাকে গুরুত্ব দিতেই হবে। নতুবা আপনার জন্য তা মঙ্গলজনক হবে না।" শাহ্ পেরনের মতামত মেনে নিতেন ঝামেলা এড়ানোর জন্য।

শাহের উপর পেরনের আধিপত্যের কারণ তার ক্ষমতার কারণে নয় বরং শাহের দুর্বলতার কারণে। শাহ্ তার শাসনকালের পুরোসময় জুড়েই এ দুর্বলতার প্রমাণ দেন।

পেরনের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার বিপরীত। সে তার ইরানী বন্ধুদের জন্য পদবী আদায় করতো আর তার শত্রুদের পদাবনতি ঘটাতো অথবা এদেরকে শাস্তি দিতো। সে নিজেই অনেক পদস্থ অফিসারকে নিয়োগ দানের ক্ষমতা রাখতো। কেবল মাত্র মন্ত্রী অথবা সংসদ সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সে শাহ্'র সাহায্য নিত এবং সে অবশ্যই সফলকাম হতো। পেরনের বন্ধুত্ব অথবা শত্রুতা উভয়ই চরম ছিল এবং সে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে অভ্যস্ত ছিলনা।

রাজ পরিবারে পেরন চমৎকার অবস্থান গড়ে তোলে। রাজ পরিবারে সকল গুরুত্ব-পূর্ণ ব্যক্তি ও ডিগনিটারিজ পেরনের সাথে সম্পর্ককে স্বাগত জানাতো আর এ কারণেই তাদের কাছেও পেরন বেশ ঘনিষ্ঠ হতে পারতো। এ সুযোগে সে এসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে বৃটিশ দূতাবাসে এসব পাচার করতো। সরকারী কর্মকর্তারাও পেরনের ক্ষমতা ও আধিপত্য সম্পর্কে অবগত

www.pathagar.com

ছিলেন, তাই মন্ত্রীরাও নিজেদের সমস্যা নিয়ে পেরনের কাছেই ধর্না দিতেন। পেরন শাহ্'র সাথেও রুক্ষ ভাষায় কথা বলতে দ্বিধা করতোনা, তাই সাধারণ কর্মচারী কর্মকর্তাদের সাথে তার আচরণ কতোটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ ছিল তা সহজেই অনুমেয়। সে বলতো, "এটা আমার হুকুম, এভাবে কাজ করুন"। সবাই তার এ আদেশ মানতে প্রায় বাধ্য ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে এসব নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য করতো এবং নিশ্চিতভাবে এহেন দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণের পেছনে বৃটিশ দূতাবাসের কোন হাত ছিলনা।

পেরন শাহের ঘনিষ্ঠজনদের নির্বাচন করতো। ফউজিয়া যখন শাহ্'র স্ত্রী ছিলেন তখন আমি ও পেরন নিয়মিতই এক টেবিলে মধ্যাহ্নভোজ অথবা রাতের খাবার খেতাম। পেরন আমার প্রতি অন্তত বিশ্বস্ততার ভান করতো। কিন্তু ক্রমান্বয়ে পেরন শাহের জীবনে আরো দু'জন ব্যক্তিকে নিয়ে আসে। একজন হলেন তেহরানের শুক্রবারের প্রার্থনার নেতা সাঈদ হাসান ইমামীর আত্মীয় তাঘি ইমামী এবং অন্যজন পাহ্লভী ফাউন্ডেশনের হোটেল সমূহের প্রধান ফাথোল্লাহ্ আমির আলাই। এ দু'জনের নিয়োগ প্রাপ্তির ফলে আমি আনন্দিত হই, কারণ এর ফলে আমার কর্মব্যস্ততা কিছুটা কমবে। ফাথোল্লাহ্ আমির আলাই সম্ভবত শাহের সহকর্মীর দায়িত্ব পালনে কিছুটা অযোগ্য ছিলেন কিন্তু সাঈদ হাসান ইমামী এ পদের জন্য যথোপযুক্ত ছিলেন। ইমামী ছিলেন একজন সুদক্ষ খেলোয়ারও বটে। আর সে কারণেই তিনি এক্ষেত্রে শাহের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। আমি নিজেও যখনই শাহ্ এবং ইমামীকে কোথায়ও দেখতাম তখন তাদেরকে একান্ত সময় যাপনের সুযোগ করে দিতে নিজে সে স্থান ত্যাগ করতাম। পেরন এ দু'জনকে পর্যাপ্ত অর্থ প্রদান করতো। কারণ এদের দু'জনেরই আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। তবে এ অর্থ গ্রহণের বিনিময়ে এরা পেরনের কাছে নিয়মিতভাবে তথ্য সরবরাহ করতো।

আমি আগেই বলেছি পেরন, শাহ'র সাথে খুব রুক্ষস্বরে কথা বলতো। কর্কশভাবে সে শাহ্কে বলতো, "আপনি কথা বলারও যোগ্য নন।" এসব কথা পেরনের মুখে শোনার পর শাহ্ তাকে তার দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন বলেই মনে করতাম। কিন্তু বাস্তবে তা হতোনা। বড়জোর দু-তিন দিন শাহ্ তার সাথে কথা বলতেন না। কিন্তু পরে আবার তারা কথা বলতে শুরু করতেন। আসলে এসব ছিল শাহ্'র দুর্বলতারই বহিঃপ্রকাশ। আমি মাঝে মাঝে ভাবতাম, আমার যদি শাহ্'র অবস্থান হতো তাহলে আমি অবশ্যই পেরনকে তার ধৃষ্টতাপূর্ণ ব্যবহারের জন্য তাকে দেশ থেকে বের করে দিতাম। কিন্তু শাহ্ সেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতেন না। ক্রমশ আমি শাহ্ আর পেরনের এহেন বিষয়াবলীতে অভ্যস্ত হয়ে পরি এবং পরবর্তীতে এসব আর আমাকে অবাক করতোনা।

www.pathagar.com

পেরন ছিল কিছুটা বাচাল গোছের। সে কোন বিষয়েই গোপন রাখতে পারতোনা। ফলে বৃটিশ দূতাবাসের নিম্ন পর্যায়ের অফিসারদের সাথেই তার যোগাযোগ ছিল। বৃটিশরা ইরানী অফিসারদের সাথে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব অনুযায়ী আচরণ করতো। এ ক্ষেত্রে আমার সাথে তাদের আচরণ ছিল খুবই বিনম্র এবং শান্ত। যাতে আমি কোন অবস্থাতেই ক্ষুব্ধ বা মনক্ষুণ্ন না হই। কিন্তু পেরনের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

শাহ্'র সাথে সুরাইয়ার বিয়ের দু'বছর পর্যন্ত এমনটা চলতে থাকলো। এ সময়ে পেরনের কিডনীতে সমস্যা দেখা দেয় এবং তার ডান পা অবশ হয়ে যায়। যার ফলে তাকে একটা লাঠির সাহায্য নিয়ে হাঁটতে হতো। পেরন সুইজ্যারল্যান্ডে যেতে বাধ্য হয়। সুরাইয়া রানী হলে শাহ্'র বন্ধুদের অনেককেই প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সুরাইয়া প্রতি শুক্রবারেই শাহ্'র বন্ধুদের প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানাতেন। একদিন এমনি একটি আমন্ত্রণে আমিও উপস্থিত ছিলাম। ওয়েটার এসে আমাকে বললো আমার ফোন এসেছে। ফোনের অপরপ্রান্তে সুইজ্যারল্যান্ডে ইরানের রাষ্ট্রদূত হোরমাজ গরিব। তিনি আমাকে বললেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে মান্যবর পেরন হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমি তাৎক্ষণিকভাবে শাহ্কে খবরটা দিলাম। কিন্তু তার মাঝে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম না। হয়তো তিনি তার অবচেতন মনে পেরনের কবল থেকে রেহাই চাচ্ছিলেন। পেরনের মৃত্যু সংবাদ শাহ্'র মনে কোন দুঃখ, শোক এমনকি সামান্য কোন অনুভূতিরও জন্ম দিলনা। তিনি শুধু অতিথিদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "পেরন মারা গেছে।" পেরনের মৃত্যুর পর জেনারেল ডাঃ আবদুল করিম আয়াদি রাজ দরবারে তার স্থলাভিষিক্ত হন। তাকে যথার্থভাবেই "ইরানের রাস্পুটিন" নামে ডাকা হতো।

জেনারেল ডাঃ আবদুল করিম আয়াদি একজন শান্ত-ভদ্র লোক ছিলেন এবং তিনি কখনো রুক্ষ ব্যবহার করতেন না। যখন সুরাইয়া সম্রাজ্ঞী হিসেবে রাজ দরবারে ছিলেন তিনি তার "বখতিয়ার" সম্প্রদায়ের লোকদের প্রায়শই দরবারে আমন্ত্রণ জানাতেন। আমি তখন কিছুটা নীরবতা অবলম্বনের পথ বেছে নিই। কিন্তু আয়াদি সুরাইয়ার দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন এবং বখতিয়ার সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যেও জনপ্রিয় অবস্থান গড়ে তোলেন। এ সময়ে আয়াদি সর্বদাই শাহ্, তার স্ত্রীগণ এবং সঙ্গী সাথীদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে শুরু করেন। তিনি এ সব ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সংগৃহীত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি বৃটিশদের কাছে পাচার করতেন। কারণ তখন দরবারে, বিভিন্ন ভোজসভায় এমনকি শাহ্র

www.pathagar.com

বন্ধুদের বাড়িতে বৃটিশ এম্বেসীর এজেন্ট অথবা এমআই-৬ গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা নিয়মিত যাতায়াত করতেন ; আর তাই ডাঃ আব্দুল করিম আয়াদির পক্ষে বৃটিশদের কাছে তথ্য পাচার অনেক সহজ হয়ে যায়। এ সময়ে আয়াদি ছাড়াও জুনিয়র শাহ্পওর বৃটিশ দূতাবাসের প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ নিয়মিত প্রদান করায় আমার প্রতি বৃটিশদের আগ্রহ হ্রাস পায়। বৃটিশরা শাহ্'র ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সবসময়ই ব্যাপকভাবে অবগত ছিল। বাল্যকালে এ তথ্য তারা পেত মিসেস আরফার কাছ থেকে। পরবর্তীতে আর্নেষ্ট পেরন, আয়াদি এবং সোলায়মান বেহ্বুদির কাছ থেকে।

আয়াদি কখন এবং কিভাবে দরবারে স্থান পেলেন এবং তার ক্ষমতা কতদূর ছিল ঃ

আলি রেজা ছিলেন মোহাম্মদ রেজার আপন ভাই। তিনি ছিলেন নিরিবিলি এবং শান্ত স্বভাবের মানুষ যিনি পরিবারের সকল সদস্যের সাথেও তেমন সম্পর্ক রাখতেন না। তিনি রাষ্ট্রীয় ভোজ এমনকি পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানেও তেমন যোগ দিতেন না। কখনো কোন অনুষ্ঠানে একান্তই যদি যোগ দিতে হতো তবে তিনি কয়েক মিনিট পরই সেখান থেকে প্রস্থান করতেন। ইরানে দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় আসা পোলিশ এক পরিবারেই তিনি দরিদ্র একজন পোলিশ রমনীকে বিয়ে করেন। তার বিয়ে হয় প্যারিসে এবং আলি পারিক নামে একটি ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। আলি রেজা, মোহাম্মদ রেজার মতোই প্রায়শই অসুস্থ বোধ করতেন। শাহ্ সর্বদাই একজন চিকিৎসক তার আশে পাশে না থাকলে অস্বস্তি বোধ করতেন। উভয় ভ্রাতাই "মাইক্রোফোবিয়া" নামক অসুখে ভুগতেন। এ রোগের ফলে এরা সর্বদাই একধরনের জীবাণুর ভয়ে মানসিক অশান্তিতে কাতর থাকতেন। শাহ্'র আশে পাশে কোন চিকিৎসক না থাকলে তিনি অবিলম্বে চিকিৎসক ডাকার নির্দেশ দিতেন এবং বার বার তার আশে পাশের লোকদের এমনকি ভৃত্যদের পর্যন্ত ডেকে আশ্বস্ত হতে চাইতেন যে তিনি কোন জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হননি। আলি রেজাও একই ধরনের অসুখে ভুগতেন কিন্তু তিনি থাকতেন খুবই নিরিবিলি এবং জন বিচ্ছিন্নভাবে। আলি রেজার গোটা জীবন কাটে পাহাড়ে শিকার করে এবং তিনি হাসান নামে এক অশিক্ষিত পাকা শিকারীকে খুব পছন্দ করতেন। হাসান ছিল রাজকীয় শিকার এলাকার রক্ষী। শাহ্'র মানসিক রোগ সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং এ রোগের ফলে তিনি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ইরানের যে ক্ষতি সমূহ সাধন করেন সেগুলো থেকে ত্রাণ পেতে কয়েক যুগ সময় লেগে যাবে। রেজা শাহ্'র পরিবারে তিনি নিজে এবং তার সন্তান-সন্তদিরা সকলেই একধরনের মানসিক রোগে ভুগতেন। এটা অনেকটা ছোঁয়াছে রোগের মতোই। রেজা শাহ্'র কাছ থেকে

www.pathagar.com

সন্তানরাও তা ধারণ করে। শাহ্ পরিবারের এ অদ্ভুত রোগ সম্পর্কেই আলাদা একটা বই লেখা যায়।

আমরা আবার আয়াদির ঘটনার দিকে ফিরে তাকাব। আমি আগেই বলেছি যে আলি রেজার মারাত্মক ধরনের মানসিক রোগ ছিল। তিনি সর্বদাই তার পাশে একজন চিকিৎসককে রাখতে চাইতেন। তিনি রাজকীয় সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সাহায্য চাইলে আয়াদিকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। ডাঃ আয়াদি একজন সাধারণ মানের চিকিৎসক ছিলেন যার মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ কোন জ্ঞান ছিলনা। তবু তার উপস্থিতি আলি রেজাকে মানসিক প্রশান্তি দিত। আয়াদির পিতা ছিলেন একজন বড় মাপের "বাহাই" ধর্মের নেতা। আয়াদিও এ পদ লাভ করেন। বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থা অনেক আগে থেকেই তার প্রতি আগ্রহী হয়। আয়াদির একজন প্রথম সারির গোয়েন্দা হওয়ার যোগ্যতাও ছিল। এ কারণেই আয়াদিকে রাজ দরবারে অন্তর্ভুক্ত করানো হয় এবং ইসলামী বিপ্লব পর্যন্ত তিনি পশ্চিমাদের অন্যান্য"ক্রিড়নকের" চেয়ে ভাল ভূমিকা রাখেন। আয়াদিকে বলা হতো ইরানের রাস্‌পুটিন। এবং এটা তার যথার্থ নামকরণ। যে কোন সুন্দরী মহিলাই তার হাত থেকে রেহাই পেতনা। অবশ্যই সেসব সুন্দরীদের আয়াদি সরকারী উচ্চ পদে পদোন্নতি দিতেন অথবা উদারভাবে মূল্য দিতেন। আয়াদি কেবল তার শয়ন কক্ষেই নয় তার অফিসে পর্যন্ত মেয়েদের নিয়ে আমোদ-ফুর্তি করতেন। মহিলাদের নিয়ে আয়াদির কান্ড-কীর্তি এতো অশ্লিল পর্যায়ে যেত যে এসব এখানে বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। ডাঃ আয়াদি ও ডাঃ বাসতান খুব ভাল বন্ধু ছিলেন এবং তাদের আবাসও ছিল খুব কাছাকাছি। তারা উভয়েই ছিলেন ভীষণভাবে নারী লিপ্‌সু। তারা তাদের অফিস অথবা অন্যত্র থেকে মেয়ে সংগ্রহ করতেন এবং নিজেদের মধ্যে মেয়ে বদল করতেন। আয়াদির অফিসে ধীরে ধীরে মহিলাদের যাতায়াত বাড়তে থাকে। আয়াদি ছিলেন একজন চৌকষ গোয়েন্দা এবং বৃটিশ ও মার্কিন গোয়েন্দাদের পক্ষে তিনি খুব দক্ষতার সাথে কাজ করেন। শাহের উপরও তার প্রভাব ছিল ব্যাপক। প্রধানমন্ত্রী (বিশেষ করে হোভায়দা), চীফ অফ ষ্টাফ, পদস্থ কর্মকর্তা, মন্ত্রী, মজলিস নেতৃবৃন্দসহ সকলেই আয়াদির ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিতেন। আয়াদি প্রথমত তাদেরকে অনুরোধ করতেন এবং ইচ্ছানুযায়ী কাজ না হলে হুকুম করে কাজ আদায় করে নিতেন। শাহ্'র সব বিদেশ সফরেই আয়াদি ছিলেন তার অপরিহার্য্য সঙ্গী। এজন্যেই তার গুরুত্ব আরো বাড়তে থাকে। বিপ্লবের কিছুদিন আগে ১৯৭৯ সনে আয়াদি ইরান ত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

শাহ্ এবং রমনীরা ঃ

শাহ্'র বিবাহিতা জীবন কখনোই সুখের ছিল না। তিনি আগা গোড়াই ছিলেন একজন নারী লিপ্সু ব্যক্তি। আমি আগেই বলেছি শাহের জীবনে প্রথম নারী লে-রোসে স্কুলের ভৃত্যা যার সাথে শাহ্কে পরিচয় করিয়ে দেয় পেরন।

১৯৩৬ সালে তিনি ইরানে প্রত্যাবর্তন করলে যা-তা মহিলাদের সাথে সম্পর্ক গড়ার দায়ে রেজা শাহ্ তাকে এড়িয়ে চলতেন এবং মোহাম্মদ রেজার মাকে বলেন তার জন্য যোগ্য একটা মেয়ে পছন্দ করতে।

রাজ দরবারের নির্দেশে একজন সেনা চিকিৎসকের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী ফিরোজাকে আমি দরবারে নিয়ে আসি। অপূর্ব সুন্দরী ফিরোজাকে আমি আনতে গেলে তিনি দু'ঘন্টা ধরে সাজগোছ করার পর দরবারে আসেন। মোহাম্মদ রেজার সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলে তিনি খুবই আনন্দিত হন। ফউজিয়ার সাথে মোহাম্মদ রেজার পরিণয় পর্যন্ত এ সম্পর্ক টিকে ছিল। ফিরোজা প্রাসাদেই থাকতেন এবং প্রতি মাসে ৩০০ টোমান বেতন পেতেন। এছাড়া তিনি কাপড় চোপড় কেনার জন্য আরো অর্থ পেতেন। ফউজিয়াকে বিয়ে করার আগে শাহের নির্দেশে ফিরোজাকে সরিয়ে দেয়া হয়। তাকে ৫ লাখ টোমান দেয়া হয় এবং ইরান ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। পাঁচ লাখ টোমান ব্যাপক অংক কারণ একজন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে আমি মাসিক বেতন পেতাম ৫৫ টোমান। অর্থ-বিত্তসহ ফিরোজা রোমে চলে যান। পরবর্তীতে তিনি ইংল্যান্ডে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন।

ফউজিয়ার সাথে বিয়ের পর দিভালসার নামে একটা মেয়ের সঙ্গে শাহ্র গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠে। আমি নিশ্চিত যে দিভালসারকেও শাহ্ বিপুল অংকের টোমান প্রদান করেন। কারণ পরবর্তীতে দিভালসার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস্-এ বিশাল বাড়িতে বৈভবের সাথে বসবাস করতে থাকেন।

শাহ্-ফউজিয়ার বিচ্ছেদের পর তিনি আমাকে একটা মেয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। একদিন কর্মকর্তাদের ক্লাবে আমি একজন মহিলা ও তার ১৭-১৮ বছর বয়েসী সুন্দরী কন্যাকে দেখি। আমি তাদের কাছে আমার পরিচয় দিলে তারা সাগ্রহে আমার সাথে পরিচিত হন। পরবর্তীতে মোহাম্মদ রেজার কথামতো আমি ১৭-১৮ বছর বয়েসী সুন্দরী পরি ঘাফারীকে সোরখে হেশার প্রাসাদে নিয়ে আসি। শাহ্ মেয়েটির সাথে দীর্ঘসময় ধরে কথা বলেন এবং পরবর্তীতে তাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সুরাইয়াকে বিয়ে করার পূর্বপর্যন্ত পরি ঘাফারীর সাথে শাহের সম্পর্ক ছিল। শাহ্ তাকেও বিপুল অর্থ প্রদান করেন। পরবর্তীতে পরি তেহরানে সুন্দর একটি বাড়ি ক্রয় করেন। শাহ্

www.pathagar.com

এ মেয়েটিকে ভালোবাসতেন কিন্তু সুরাইয়াকে বিয়ে করার জন্য তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য হন।

সুরাইয়াকে বিয়ে করার আগে শাহ্ ইউরোপীয় রাজ পরিবারে বিয়ে করছেন বলে শুনেছিলাম। তিনি হল্যান্ডের রাজ পরিবারের ব্যাপারে ভাবছিলেন। কারণ তাদের অনেক কন্যা ছিল এবং সেদেশের শাসকও ছিলেন একজন মহিলা। হল্যান্ড থেকে নিরাশ হওয়ার পর তিনি ইতালিয়ান রাজ পরিবারে পাত্রী খোঁজেন। তিনি ইতালির ক্ষমতাচ্যুত সম্রাটের কন্যাকে তার ভাইসহ তেহরানে আমন্ত্রণ জানান। মোহাম্মদ রেজার মা এবং শামস্ ও আশরাফ এ ঘটনায় দারুণভাবে নাখোশ হন। তারা ভাবলেন মোহাম্মদ রেজা কিভাবে একটা খৃষ্টান মেয়েকে বিয়ে করবে যে কিনা ইরানের ক্রাউন প্রিন্সের মা হবে। মোহাম্মদ রেজার মা ইতালিয়ান প্রিন্সেসকে তার ভাইসহ প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। পথিমধ্যে আব্দুল রেজা'র স্ত্রী যে কিনা প্রচন্ড বাচাল ছিল সে প্রিন্সেসকে উদ্দেশ্য করে বললো, "আপনি কি জানেন কি নিদারুণ পরিণতি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে? আপনি তো প্রাসাদের সমস্যা সম্পর্কে অবগত নন। আপনি শাহ্'র স্ত্রী হবেন ঠিকই কিন্তু আপনি হবেন রাজমাতা আর আশরাফের কর্তৃত্বাধীন। এরা আপনার জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলবে।" ইতালিয়ান প্রিন্সেস ও তার ভাই আব্দুল রেজার স্ত্রীর তথ্যে রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়লেন। তারা প্রাসাদের ভোজসভায় কিছুই বললেন না তবে পরের দিন ভাইটি মোহাম্মদ রেজাকে বললেন যে তার বোনের পক্ষে এখন বিয়ে করা সম্ভব নয়। মোহাম্মদ রেজা কারণ জিজ্ঞেস করলে ইতালির রাজা দ্বিতীয় ওমবের্তোর কন্যা মারিয়া গ্যাবরিয়েলা ডি সাভা'র ভাই শাহ্কে বললেন, "আপনার পরিবারের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে"। শাহ্ ইতালিয়ান যুবরাজের কাছে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে সহজ সরল যুবরাজ মোহাম্মদ রেজার কাছে সব ঘটনা খুলে বললেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে মোহাম্মদ রেজা আব্দুল রেজার স্ত্রীর জন্য অন্য যেকোন প্রাসাদে যাওয়া নিষিদ্ধ করলেন এবং ত্রিশ বছর এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে। স্যার ডেনিস রাইটের মতে মোহাম্মদ রেজা বৃটিশ রাজ পরিবারে প্রিন্সেস আলেকজান্দ্রাকেও বিয়ে করার প্রয়াশ চালান।

সুরাইয়ার সাথে শাহ্'র বিয়ের পর "বখতিয়ার"রা দরবারে আসেন এবং শাহ্ সর্বদাই তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। তবে বখতিয়ারগণ ফারাহ্ দিবা'র পরিবারের মতো তাদের অবস্থানের বিনিময়ে কোন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতেন না। সুরাইয়ার ব্যক্তিত্বের কারণেই এমনটা হতো। আমি আগেই বলেছি মোসাদ্দেঘের ক্ষমতা দখলের পর শাহ্ একাকিত্বকে বেছে নেন এবং তখন মধ্যাহ্নভোজ অথবা নৈশভোজ উনি শুধু সুরাইয়াকে

www.pathagar.com

নিয়েই করতেন। সাথে থাকতাম আমি ও পেরন। ১৯ আগষ্ট অভ্যুত্থানের পর ১০০-১৫০ বখতিয়ারকে ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু সুরাইয়া সর্বদাই রাজমাতা ও আশরাফকে এড়িয়ে চলতেন। রাজমাতা'র প্রাসাদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ আর নিখুত ষড়যন্ত্রে শাহ্'র সাথে সুরাইয়ার বিচ্ছেদ হয়ে যায়। শাহ্-সুরাইয়া বিচ্ছেদের পর বখতিয়ার সম্প্রদায়ভুক্তরা দরবার থেকে বহিস্কৃত হন।

সুরাইয়া একজন সুন্দরী মহিলা ছিলেন, কিন্তু তার ছিল অন্তঃর্মুখি লাজুক স্বভাব। শাহ্ সুরাইয়ার বিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে টিকে ছিল। কিন্তু তিনি সন্তান জন্মদানে ব্যর্থ হন। অবশ্য শাহ্ নিজেও পুত্র সন্তান চাইতেন না কারণ তিনি মনে করতেন পুত্র সন্তানই ক্ষমতা দখলের জন্য তাকে হত্যা করতে পারে। শাহ্'র সাথে বিচ্ছেদের পর সুরাইয়া প্রতি মাসে ৩০ হাজার টোমান ভাতা পেতেন এবং তিনি জার্মনীতে খুবই বিলাশী জীবন যাপন করতে থাকেন। সুরাইয়ার সাথে বিচ্ছেদের পর গীতি খাতির নামক একজন বিধবার সাথে শাহ্'র সম্পর্ক গড়ে উঠে। শাহের সাথে গীতি খাতিরের অবৈধ সম্পর্ক শাহ্-ফারাহ্ বিয়ের আগ পর্যন্ত টিকে ছিল। গীতিকে শাহ্ ১ মিলিয়ন টোমান ও বহু ধনরত্ন প্রদান করেন যা দিয়ে গীতি খাতির ইতালিতে বসতি গাড়েন।

ফারাহ্ দীবা ছিলেন শাহ্র আনুষ্ঠানিক স্ত্রী, কিন্তু অসংখ্য মহিলার সাথে শাহের সম্পর্ক ছিল। অসংখ্য বিমান বালার সাথে এবং সুন্দরী রমনীর সাথে শাহ্ রাত কাটিয়েছেন। তার যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় অনেক নারীর সাথেই সময় কাটান।

শাহে্'র নিউইয়র্ক সফরের সময় আমি গ্রেইস কেলি নামক এক মার্কিন থিয়েটার অভিনেত্রীর সাথে শাহের পরিচয় করিয়ে দেই। গ্রেইস কেলি শাহ্'র সাথে দু'বার মিলিত হন এবং ১ মিলিয়ন টোমান লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি মোনাকো'র এক যুবরাজকে বিয়ে করেন। অপর মার্কিন মেয়েটি ছিল ১৯ বছর বয়েসী মিস ওয়ার্ল্ড। এ মেয়েটি শাহের সাথে বার কয়েক মিলিত হয় এবং সেও ১ মিলিয়ন টোমান মূল্যের রত্ন উপহার পায়।

ফারাহ্ দিবার পরিবার ও রাজ দরবার ঃ

ফারাহ্'র বাবা ছিলেন ফ্রান্সে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন অফিসার যিনি ক্যাপ্টেন থাকাকালে টিউবার কুলোসিস (যক্ষা) রোগে মারা যান। ফারাহ্ দিবা'র মা ফরিদা দিবা তার স্বামীর মৃত্যুর পর তার ভাই ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী কুতবী'র সাথে বসবাস করছিলেন। ফরিদা প্রায় কপর্দকহীন ছিলেন বলেই তার ভাইয়ের কাছেই থাকতেন। ফারাহ্ দিবা তার মা আর মামার সঙ্গেই অতি দরিদ্র অবস্থায় বসবাস করতেন। ফারাহ্'র মাতুল ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী কুতবী তার দারিদ্র্যতা সত্ত্বেও নিজ পুত্র এবং ফারাহ্কে লেখাপড়ার জন্য প্যারিসে

www.pathagar.com

পাঠান। ফারাহ্ সেখানে চারুকলার উপর অধ্যায়ন করতেন। দরিদ্র ফারাহ্ ছিলেন কমিউনিজমের প্রতি অনুরক্ত এবং একই মতবাদী ছাত্রদের সাথে তার ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। শাহ্'র সাথে বিয়ের পরও ফারাহ্ দীবা তার কমিউনিষ্ট মনোবৃত্তি বজায় রাখেন। তার বিশেষ দপ্তর এ মতবাদকে প্রচারে যথেষ্ট সচেষ্ট হয়।

প্যারিসে অবস্থানকালে ফারাহ্ হোসারা আর্দেশির জাহেদী'র সাথে যোগযোগ করেন তার প্যারিস অবস্থানের ক্ষেত্রে কিছু সাহায্যের জন্য। আর্দেশির জাহেদীর হোসারাকে একটা প্রাসাদ দিল। এটা ছিল নারীদের জন্য উন্মুক্ত। জাহেদী ও তার বন্ধুরা এখানে নিয়মিতভাবে মেয়েদের নিয়ে আমোদ ফুর্তি করতেন। ফারাহ্ এ ব্যাপারটা জানতেন এবং জাহেদীর কাছে প্রার্থিত সহায়তার বিনিময়ে নিজেকে অফার করেন। জাহেদী শাহ্'র সাথে যোগাযোগ করেন ফারাহ্কে রাজদরবারে নেয়ার অনুমতির জন্য। শাহ্, ফারাহ্ দীবার ব্যক্তিগত জীবন অথবা পরিবার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতেন না বলেই তাকে দরবারে নেয়ার অনুমতি দেন। শাহ্ তাকে পরবর্তীতে বিয়ের প্রস্তাব দেন। একজন মেয়ে যে অর্থের বিনিময়ে জাহেদীর কাছে নিজেকে অফার করে সেই ফারাহ্ দীবাই ইরানের রাণী হয়ে যান এবং তার জাকজমকপূর্ণ অভিষেক অনুষ্ঠানে আর এর ব্যাপক মিডিয়া কভারেজ স্মরণ রাখার মতোই আড়োম্বরপূর্ণ ছিল।

শাহের শারীরিক ও মানসিক বিকার সম্পর্কে অবগত হলেই বুঝা যাবে কিভাবে ফারাহ্'র মতো মেয়ের পক্ষে রাণী হওয়া সম্ভব হয়। রাজ পরিবারের "বধূ" হওয়ার পর ফারাহ্ এবং তার দরিদ্র পরিবারের আর্থিক অবস্থার নাটকীয় পরিবর্তন হয়। দীবার আত্মীয় স্বজন ইরানের বড় বড় নির্মাণ কাজগুলো নিয়মিতভাবে পেতে থাকেন এবং তারা এগুলো পুনরায় শতকরা ২৫ ভাগ কমিশনের ভিত্তিতে কনট্রাকটারদেরকে দিতে থাকেন। ফারাহ্ দীবার মামা কুতবী রাতারাতি একজন বিলিয়নিয়ারে পরিণত হন। ইরানের সকল দপ্তরে ফারাহ্ দীবার হাত প্রসারিত হয় এবং বড় ছোট সব ব্যবসাই তাকে কমিশন দিয়ে নিতে হতো।

১৯৭১-৭২ সনের দিকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফিরোজমান্দ আমাকে বলেন, শাহ ফারাহ্ দীবার অফিস পরিদর্শনের জন্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল নুসরাতুল্লাহ্ ফারদোস্তকে নিয়োগ করেছেন। জেনারেল নুসরাতুল্লাহ্ (লেফটেন্যান্ট জেনারেল নুসরাতুল্লাহ ফারাদোস্ত হলেন জেনারেল হোসেইন ফারদোস্তের ভাই) দেখেন যে ফারাহ্'র অফিসে ৬০০ কর্মচারী আছে যার মধ্যে বেশ কিছু বিশেষজ্ঞও রয়েছে। এ বিশাল কর্মী বাহিনী কয়েক ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি দলের কাজ ছিল পুরাতন ভবনের তথ্য সংগ্রহ। এসব তথ্য ফারাহ্ দীবার কাছে যাওয়ার পর পুরাতন ভবনগুলো তাৎক্ষণিকভাবে কিনে নেয়া হতো। কারণ

www.pathagar.com

এসব ভবনে "ক্বাজার" আমলের অতি মূল্যবান টাইলস্ থাকতো যার মূল্য ছিল বিশাল। এসব পুরাকীর্তির জন্যই ফারাহ্‌র অফিস ভবনগুলো কিনে নিত। এভাবে ফারাহ্'র দপ্তরে অসংখ্য ডিপার্টমেন্ট থেকে ইরানের বিভিন্ন এলাকা হতে প্রাচীন পেইন্টিংস্, কেলিগ্রাফি, হাতে লেখা গ্রন্থ, ঐতিহাসিক দলিল, কার্পেট ইত্যাদি সংগ্রহ হতো এবং পরবর্তীতে এসব বিপুল মূল্যে বিদেশী ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে বিপুল অর্থ ফারাহ্ দীবার একাউন্টে জমা করতো। যে ফারাহ্ একদিন অর্থের বিনিময়ে নিজেকে যাহেদীর কাছে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনিই শাহ্'র স্ত্রী হওয়ার পর রাতারাতি বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক বনে যান। ফারাহ্'র ব্যক্তিগত ব্যয় ছিল আকাশচুম্বী। তার সন্তানরাও ব্যাপক অপচয় করতেন। শাহ্ এবং ফারাহ্'র রাষ্ট্রীয় সফরে বিদেশ ভ্রমণ ছিল অস্বাভাবিক। শাহ্-ফারাহ্'র সময়কে পাহ্লভী রাজতন্ত্রের দুর্নীতি এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের সবচেয়ে কালো অধ্যায় হিসেবে আখ্যায়িত করলে অত্যুক্তি হবে না।

শাহ্ এবং তার বিত্ত ঃ

শাহ্'র বিত্ত-বৈভব সম্পর্কে লিখা আমার জন্য সহজ নয় কারণ আমি রাজ দরবারের অর্থনৈতিক বিষয়ে জড়িত ছিলাম না। একারণেই আমার কাছে সঠিক কোন হিসেব নেই। কিন্তু উত্তর ইরানে শাহ্'র যে সম্পদ ছিল সেগুলো থেকে বাৎসরিক আয় হতো ৬২ মিলিয়ন ডলার। শাহ্ দু'হাতে খরচ করতেন। তিনি তার রক্ষিতাদের মূল্যবান রত্নের মাধ্যমে বিপুল অংক দান করতেন। শাহ্'র ব্যক্তিগত খরচের সিংহভাগ আসতো রাজকোষ থেকে। রাষ্ট্রের জন্য অস্ত্র ক্রয়, রাষ্ট্রের স্থাবর সম্পদ বিক্রি, ব্যবসায়িক চুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে শাহ্ সীমাহীন অর্থ আত্মসাত করেন।

শাহ্ চৌকষ এবং কড়িৎকর্মা সেনা অফিসার জেনারেল হাসান তোফানিয়ানকে অস্ত্র ক্রয় বিষয়ে বিশেষ দায়িত্বে নিয়োগ করেন। দীর্ঘ দশ বছর তিনি এ দায়িত্বে ছিলেন এবং ইরানের জন্য অস্ত্র ক্রয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

আমার সাথে জেনারেল তোফানিয়ানের প্রথম পরিচয় ঘটে ইরানের সমর একাডেমীতে। আমি তখন ঐ একাডেমীর ছাত্র এবং তিনি সেখানে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে বক্তব্য রাখতেন। তিনি ইরান ও অন্যান্য দেশের বিমান বাহিনী কৌশলের উপর ক্লাশ নিতেন। পদবীতে তিনি ছিলেন কর্ণেল এবং বিমান বাহিনী সংক্রান্ত বিষয়ে তার ব্যাপক জ্ঞান থাকায় খুব স্বচ্ছন্দেই যেকোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন। ইংরেজিতে তার বিশেষ দখল থাকার ফলে তিনি ক্লাশে ব্যাপক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতেন এবং তার পাঠদান পদ্ধতি ছিল আমেরিকান অধ্যাপকদের মতো। শিক্ষার্থীদের এক ঘেয়েমি

www.pathagar.com

কাটানোর জন্য তিনি মাঝে মাঝেই নানা ধরনের জোকস্ বলতেন। সম্ভবত জেনারেল তোফানিয়ান যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা গ্রহণ করেন। সে সময়ে বিমান বাহিনীর একটা বিরাট অংশের অফিসারকে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নের জন্য পাঠানো হতো।

শাহ্ কেন জেনারেল তোফানিয়ানকে ইরানের অস্ত্র ক্রয়ের দায়িত্বে নিয়োগ করেন তা আমার অজানা। তবে সম্ভবত তার যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যায়ন এবং ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টাদের সাথে তার ভাল যোগাযোগের কারণেই তোফানিয়ান এ দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। শাহ্ মার্কিনীদের পরামর্শক্রমে অস্ত্র ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর জেনারেল তোফানিয়ানের দায়িত্ব হতো এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে অস্ত্র ক্রয় সম্পন্ন করা। হালকা অস্ত্র কেনা হতো ক্যাটালগ ও নমুনার ভিত্তিতে। কিন্তু ভারী সমরাস্ত্র যেমন ট্যাংক, জঙ্গীবিমান, যুদ্ধজাহাজ, ভারী অস্ত্র, সমর যান এসব শাহ্ তার ইউরোপ সফরের সময় নিজেই দেখতেন এবং কেনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেন। শাহ্ জেনারেল তোফানিয়ানকে নির্দেশ দিতেন কতোগুলো সমর পণ্য কেনা হবে এবং সেমতে তোফানিয়ান ব্যবস্থা নিতেন। অস্ত্র কেনা বেচার প্রথানুযায়ী অস্ত্র বিক্রেতারা তোফানিয়ানকে বড় ব্যবসার ক্ষেত্রে শতকরা ২ ভাগ এবং ছোট ব্যবসার ক্ষেত্রে দশমিক পাচ ভাগ কমিশন দিত। অবশ্যই তোফানিয়ানের কাজ করার ধরন ছিল এমন যে তিনি নিজে লাভ করতেন আবার শাহ্কেও সন্তুষ্ট রাখতেন। তোফানিয়ান শাহ্কে তার অর্জিত কমিশনের অংকের বিষয়ে নিয়মিতভাবে অবগত করাতেন। শাহ্ তোফানিয়ানকে যে অর্থ কমিশন খাতে দিতেন তাতে তার আয় হতো ব্যাপক। জেনারেল তোফানিয়ান ছিলেন বুদ্ধিমান, কর্মঠ, বিচক্ষণ, ভদ্র এবং তার দায়িত্বের বিষয়ে দক্ষতাসম্পন্ন। সম্ভবত তিনি অস্ত্র ক্রয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত না হলে সেনাপ্রধান নিযুক্ত হতেন। বিপ্লবের সময় জেনারেল তোফানিয়ান গ্রেফতার হন। কিন্তু পরবর্তীতে ছাড়া পেয়ে তিনি ইরান ত্যাগ করেন। ইরান ত্যাগের পূর্বে তিনি অস্ত্র ক্রয় সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র মার্কিনীদের কাছে হস্তান্তর করেন। এমন কথাও শোনা যায় যে জেনারেল তোফানিয়ানকে ইরান ত্যাগে মার্কিনীরাই সাহায্য করে। কারণ তোফানিয়ানের কাছে অস্ত্র ক্রয় সংক্রান্ত যে কাগজপত্র ছিল সেসব যদি ইরানে থাকতো তবে তোফানিয়ানের সাথে মার্কিন উচ্চপদস্থ অফিসাররা যে ব্যাপক লুটপাটে জড়িত ছিলেন তা প্রকাশিত হয়ে যেত। এবং এটা "ওয়াটার গেইট" কেলেংকারীর চেয়েও বড় কেলেংকারী হিসেবে প্রকাশিত হতো।

অস্ত্র খাতে ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে বিপুল অর্থ আত্মসাতের ঘটনার ব্যাপারে শাহের একটা "ঘটনা" আমি এখানে উল্লেখ করছি। ১৯৭১-৭২ সনের একদিন প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

হোভায়দা আমাকে পরিকল্পনা দপ্তরে সকাল আটটায় যেতে বলেন। এর আগে কখনো আমাকে পরিকল্পনা দপ্তরে ডাকা হয়নি। সেখানে আমি যেয়ে দেখি ইরানের বাৎসরিক আয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্থই সামরিক খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। প্রতিবছর ৬-৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্রসস্ত্র ক্রয় করা হতো। এ বিরাট অংকে ক্রয় হতো শাহের একক সিদ্ধান্তে। তাই সহজেই অনুমান করা যায় যে শাহ্ প্রতিবছর কতো বিরাট অংকের অর্থ কেবল প্রতিরক্ষা খাত থেকেই হাতিয়ে নিতেন।

শাহ্ কেবল ইরানের জন্যেই পশ্চিমা দেশ থেকে সামরিক সরঞ্জাম কিনতেন না বরং অন্য দেশের ক্ষেত্রেও তিনি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৬৪ সালে সউদি আরবের সাথে পশ্চিম জার্মানীর সম্পর্ক ভাল ছিলনা। কিন্তু সউদি সরকার জার্মানীর কাছ থেকে কিছু সামরিক সরঞ্জাম কিনতে চায়। এক্ষেত্রে শাহ্কে তারা অনুরোধ জানালে তিনি আনন্দের সাথে এ ক্রয়ে সম্পৃক্ত হতে সম্মতি দেন। আমাকে শাহ্ এ ব্যাপারে দায়িত্ব দিলে আমি জেনেভা ব্যাংক এর ৩২ মিলিয়ন ডলারের একটি চেকসহ সুইজ্যারল্যান্ডে যাই। মেজর জেনারেল মোতাজেদ আমার সাথে যান। পরবর্তী দিন জেনেভা ব্যাংকে আমাদের সাথে অস্ত্র ডিলারদের কথা হয়। কিন্তু জেনেভা ব্যাংকের গভর্নর বলেন যেহেতু লেনদেনটা অস্ত্র সংক্রান্ত তাই তাদের ব্যাংক এ ব্যাপারে সরাসরি জড়াবেনা। তিনি কলোনে একটি ব্যাংকে এ অর্থ ট্রান্সফার করে দেন এবং পরবর্তী দিন আমরা কলোনে'র ব্যাংকে যাই। যখন অস্ত্র ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি শেষে ডিলারদের ৩২ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করা হয় তখন তারা আমাকে ৮ লাখ সুইস ফ্রাংক প্রদান করে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি এ অর্থ কেন। তারা বলেন এটা আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারেই আমার প্রাপ্য কমিশন। আমি তাৎক্ষণিক শাহ্কে ব্যাপারটা জানাই এবং তিনি এ অর্থ দরিদ্র ছাত্রদের জন্য ব্যয় করার লক্ষ্যে নাসিরী নামক একজনের কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ দেন। আমি শাহের নির্দেশানুযায়ী কাজ করি।

আশরাফ পাহ্লভী ঃ একজন শয়তান ঃ

আশরাফ পাহ্লভীর জীবনের দিকে তাকানো জরুরী কারণ তিনি ছিলেন শাহ্ যুগের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক সক্রিয় শক্তি। তিনি এতোটাই ক্ষমতাধর ছিলেন যে শাহ্'র পক্ষেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ সম্ভব ছিল না। আশরাফ যদিও সুন্দরী ছিলেন না কিন্তু তিনি সবসময় নিজেকে সুন্দরী হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করতেন এবং সর্বদাই এক ধরনের উগ্র মানসিকতায় ভুগতেন।

আশরাফের সাথে আলী ক্বাভাম'র বিয়ে রেজা শাহ্'র প্রস্থান পর্যন্ত টিকে ছিল। এরপর আশরাফ এবং তার বোন শামস্ উভয়েই তাদের স্বামীদের তালাক দেন। আশরাফ

www.pathagar.com

তার বাবাকে দেখার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যান এবং ইরানে ফিরে আসার পথে কিছুদিন মিশরে থাকেন। সেখানে আহমদ শফিক নামক এক যুবকের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান এবং তাকে বিয়ে করতে চান। এ খবর শাহ্ জানতে পারলে তিনি আহমদ শফিককে দেখতে চান। তাকে দেখার পর শাহ্ এ বিয়েতে সম্মতি দেন। তার ঔরশে আশরাফের দু'জন পুত্র সন্তান হয়। আহমদ শফিককে বিয়ে করার আগে হাউসাং তায়মুর শাহ্'র সাথে আশরাফের প্রেম ছিল। আশরাফের সমস্যা হলো তিনি বেশিদিন একজন স্বামীকে পছন্দ করতেন না। আহমদ শফিককে তালাক দেয়ার পর আশরাফ তার প্যারিস সফরের সময় মেহ্দী বোশেহ্রীর প্রেমে পড়েন। মেহ্দী বোশেহ্রী বিখ্যাত এবং বিত্তবান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বোশেহ্রীর সাথে বিয়ের এক বছরের মাথাতেই আশরাফ তার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

আশরাফের উগ্র যৌনজীবন সম্পর্কেই একটা আলাদা বই লিখা সম্ভব। রেজা শাহ্'র শাসনামলে আশরাফ চারিত্রিকভাবে ভালো ছিলেন। কিন্তু রেজা শাহ্'র দেশ ত্যাগের পর আশরাফ দূরন্ত যৌনাচারীতে পরিণত হন। অসংখ্য পুরুষের সাথে তার সম্পর্ক হয়।

ফউজিয়া'র শাসনামলে তিনি তাঘি ইমামীর সাথে কিছুকাল সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তারপর তার মিশর সফরের সময় মালেক ফারুখের সাথে সম্পর্ক হয়। ১৯৫২-৫৩ সময়ে যখন আমি প্যারিসে তখন আশরাফের সাথে একই সঙ্গে দু'জন ফরাসী ও একজন যুগোশ্লাভ অফিসারের অবৈধ সম্পর্ক চলতে থাকে। পাকিস্তানের মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথেও আশরাফের সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং ভুট্টো যখনই ইরানে আসতেন, আশরাফ তার সাথে সময় কাটাতেন। এমনিভাবে অসংখ্য পুরুষের সাথে আশরাফের সম্পর্ক গড়ে উঠে। অনেক ক্ষেত্রে সুপুরুষদের রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের প্রভাবে পর্যন্ত বশ করে আশরাফ তার আয়ত্তে আনতেন। আর যারা আশরাফের সংস্পর্শে আসতেন তাদের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিয়োগ অথবা বিপুল অর্থবিত্ত দিয়ে সহযোগিতা করা হতো। আর্থিক দুর্নীতির ক্ষেত্রেও আশরাফ তার যথেচ্ছ যৌনাচারিতার মতোই বাঁধহীন ছিলেন। রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটের মাধ্যমে তিনি বিপুল অর্থবৈভবের মালিক হন। আশরাফের অবৈধ আয়ের পথগুলোর মধ্যে একটি হলো লটারী থেকে আয়— যা থেকে তিনি মাসে ৪-৫ মিলিয়ন টোমান আয় করতেন। আমি এ ব্যাপারে শাহ্'র কাছে রিপোর্টও দেই কিন্তু বরাবরের মতোই শাহ্ এ বিষয়ে নীরব থাকেন। আশরাফ মাদক দ্রব্যের ব্যবসার সাথেও জড়িত ছিলেন এবং মার্কিন মাফিয়াদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। যখনই তিনি বিদেশ সফরে যেতেন তার সাথে অন্যান্য মালপত্রের মাঝে এক স্যুটকেইস হেরোইন যেত,

www.pathagar.com

সেটাতে হাত দেয়ার সাহস কারো ছিলনা। আশরাফের মাদক ব্যবসার ব্যাপারেও আমার কাছে তথ্য এলে আমি শাহ্কে ব্যাপারটা জানাই। কিন্তু তিনি নির্বিকার থাকেন। ইরানের অভ্যন্তরে এসব তথ্য সাধারণের মাঝে জানাজানি হতে থাকে এমন কি বিদেশী পত্র-পত্রিকায় অনেক খবরও প্রকাশিত হয়। আশরাফ হলেন পাহ্লভী রাজতন্ত্রের দ্বিতীয় ক্ষমতাধর মানুষ যাকে "পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহিলা দুর্নীতিবাজ" বললে অত্যুক্তি হবে না। মাদকাশক্ত, মাদক ব্যবসায়ী, দূর্নীতিবাজ, পুরুষলোভী বিকৃত যৌনাচারী আশরাফের সম্পর্কে অনেক কথাই লেখার অযোগ্য।

মাফিয়া ও রাজদরবার ঃ

শাহ্'র শাসনামলে মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয় এবং বেশ কয়েকজন ক্ষুদ্র মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক চোরাচালানীকে শাস্তি দেয়া হয়। এমনটা হয় যখন আশরাফের মাদক ব্যবসার ব্যাপারটা ইরানে "ওপেন সিক্রেটে" পরিণত হয় এবং বিদেশী পত্র-পত্রিকায় এ বিষয়ে বেশ কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়। ইরানে পপি চাষের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ নেয়া হয় ডাঃ জাহানশাহ্ সালেহ্'র মন্ত্রীত্বকালে যখন তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। আসলে এ প্রচারণা ছিল মার্কিনীদের ইশারায় যাতে আফগানিস্তান ও তুরস্ক এই অবৈধ ব্যবসা থেকে সহজেই আয় করতে পারে। ইরানে মাদক ব্যবহারের বিস্তার ঘটে আশরাফ ও তার দু'জন সঙ্গীর কারণে। আশরাফের সহযোগীদের একজন হলেন ডাঃ ফিলিক্স আঘায়্যান। তিনি একজন ক্ষমতাধর আন্তর্জাতিক মাদক ব্যবসায়ী যিনি সিআইএ, এফবিআই এবং মাফিয়াদের কর্মকান্ড সম্পর্কে বিশেষ অবগত ছিলেন। তিনি বিপুল অর্থব্যয়ের মাধ্যমে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার খুব উচু পর্যায়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ফিলিক্স শাহ্'র সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং বেশিরভাগ অবসর সময় তিনি শাহ্'র সাথেই কাটাতেন। প্রতিদিন গভীর রাত পর্যন্ত তিনি শাহ্'র সাথে তাস খেলতেন। স্বামী হিসেবে ফিলিক্স খুবই খারাপ ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি কাটাতেন পানশালার মেয়েদের সাথে। ডাঃ ফিলিক্স আঘায়ানের স্ত্রী নিনো তার প্রতি বিরক্ত হয়ে তাকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু আশরাফ তাকে বিরত করেন। ডাঃ ফিলিক্স তেহরান, আবাদান এবং খোরামশেহ্র-এ অবৈধ ক্যাবারে চালাতেন।

ফিলিক্সের পর যার নাম বলা দরকার তিনি হলেন আমির হোসেইন দাভালো যাকে "ইরানী কেভিয়ারের রাজা" বলা হতো। তিনি শাহ্'র খুব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত হন এবং তিনি শাহ্'র শয়নকক্ষে নিয়মিতভাবে ইরানী ও ফরাসী সুন্দরী মেয়ে সরবরাহ করতেন। শাহ্ তাকে শ্রেষ্ঠ মানের আফিম বিনামূল্যে যত পরিমাণ তার প্রয়োজন তা দেয়ার জন্য

www.pathagar.com

রাজ কর্মচারীদের নির্দেশ দেন। ইরানের অনেক পদস্থ কর্মকর্তা এমনকি সাধরণ মানুষও শাহের কাছ থেকে অথবা রাজ দরবার থেকে বিশেষ সুবিধা লাভের আশায় দাভালোর শরনাপন্ন হতেন। দাভালোও সেগুলো শাহ্‌কে দিয়ে করিয়ে নিতেন। তার বাড়িতে সর্বদাই তিন চারজন সুন্দরী মেয়ে থাকতো। দাভালোর সাথে আশরাফ ও তার কন্যা আযাদেহ্'র ব্যবসায়িক ও অনৈতিক সম্পর্ক ছিল। দাভালোর প্যারিসেও বিরাট বাড়ি ছিল এবং তিনি ফ্রান্সকে খুবই ভালোবাসতেন।

জেনারেল গোলাম আলী ওয়েইসি ছিলেন একজন নিম্ন শিক্ষিত স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন অফিসার। যখন তিনি যান্দারমেরিস'র কমান্ডার ছিলেন তখন তিনি আফগানিস্তান ও তুরস্কে মাদক পাচার ব্যবসায় নিয়মিত বখরা নিতেন। তার স্ত্রী কিরমানে একটি আফিম বিতরণের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। ওয়েইসি মাদক ব্যবসার মাধ্যমে ৫ বিলিয়ন টোমান আয় করে সম্পূর্ণ অর্থ বিদেশী ব্যাংকে পাঠিয়ে দেন। শাহ্‌র সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তিনি তার শিক্ষাগত এবং অভিজ্ঞতাগত দুর্বলতা সত্ত্বেও দ্রুত পদোন্নতি লাভ করেন। জেনারেল গোলাম আলী ও ওয়েইসি'র মাদক ব্যবসার সাথে শাহ্ পরিবারেরও যোগসাজশ ছিল যার ফলেই তিনি খুব নির্বিঘ্নে এ অবৈধ ব্যবসার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে অর্থে বিত্তে ফুলে ফেঁপে উঠেন।

ইরানে বিদেশী গোয়েন্দারা ঃ

ভারত উপমহাদেশ (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং কাশ্মীর) যখন বৃটিশ কলোনীতে পরিণত হয় তখন ইরান এবং আফগানিস্তানের সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যৌথ সীমান্ত ছিল। যার কারণেই এ দুই দেশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে গণ্য করা হয়। রাশিয়ার জার (শাসক) পিটার দ্যা গ্রেট তার বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন, "পারস্য-উপসাগরের উত্তপ্ত জল এবং ওমান সাগর রাশিয়ার আন্তর্জাতিক আগ্রাসনের চাবিকাঠি। বৃটিশ শাসক যারা রুশ বিরোধী ছিলেন তারা এ দুই দেশের মাধ্যমে রাশিয়ার আগ্রাসনকে রোধ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। আমরা যখনই বৃটিশদের সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের দিকে তাকাব, তখন দেখবো যে তারা যখন রুশ শক্তিকে ইরানের উত্তর প্রান্তে প্রতিরোধে অক্ষম হয় তখনই তারা ইরানের দক্ষিণ, পূর্ব এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মাধ্যমে বৃহত্তর প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়। এখানে স্থানীয় গোত্র প্রধান এবং বৃটিশদের ভূমিকার কথা জানা যায়। গোত্র প্রধানরা ছিলেন ইরানে বৃটিশদের পক্ষে। "কাজর" শাসনামলে বৃটিশরা ইরানে বেশ সক্রিয় ছিলেন যার প্রমাণ ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

এটা স্বাভাবিক যে বৃটিশরা ইরান সম্পর্কে নিখুঁত তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী হয় এবং এ কারণেই বৃটিশদের জন্য ইরানে ব্যাপক গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক স্থাপনের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণ এবং গোত্রপতিদের লাভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

শেখ খাজেল ছিলেন খোসেস্তানে বৃটিশদের এজেন্ট। তিনি কিছুকালের জন্য একটি স্বায়তশাসিত সরকার গঠন করেন। খাজেলকে বৃটিশরা নির্দেশ দেয় রেজা শাহ্‌কে মান্য করার জন্য। খাজেল তার অস্থাবর সম্পদসমূহ বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে কেবল স্থাবর সম্পত্তি সমূহ তার সন্তানদের জন্য রেখে দেন। বৃটিশদের প্রভাবের ফলেই খাজেলের ছেলে শেখ আহমদ শাহ্‌'র দরবারে সিভিল এডজুটেন্টস নিযুক্ত হন। তিনি দরবারের একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন এবং শাহ্‌'র কয়েকটি সফরে সফরসঙ্গী হন।

বৃটিশরা ফার্স-এর ক্বাভাম-আল্‌-মোল্‌ক সিরাজী পরিবারেরও সহযোগিতা প্রাপ্ত হয়। ক্বাভাম-আল্‌-মোল্‌কের ছেলে আলী ক্বাভাম রেজা শাহ্‌'র কন্যাকে বিয়ে করেন। ক্বাভাম এবং রেজা শাহ্‌ নিজেদের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং ১৯৪১ সনের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সময়ে তিনি রেজা শাহ্‌ ও বৃটিশ দূতাবাসের মধ্যে যোগসূত্র তৈরীতে সফল ভূমিকা রাখেন। ক্বাভামের সাথে বৃটিশদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ছিল।

আমির আসাদোল্লাহ্‌ আলমের পিতা শওকাত আল্‌-মুল্‌ক আলম, সিসতান, বালুচেস্তান এবং খোরাশান প্রদেশে বৃটিশদের স্বার্থের পক্ষে ছিলেন। তিনি ইরান ও বৃটেনের যৌথ বাহিনীর মাধ্যমে সোভিয়েত আগ্রাসন প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেন যাতে উত্তর ইরান সীমান্ত পেড়িয়ে সোভিয়েতরা ভারত উপমহাদেশ এবং ওমান সাগরের দিকে অগ্রসর না হতে পারে। শওকাত-আল্‌-মুল্‌ক ব্রিজান্দ এলাকায় অবস্থান নেন এবং রেজা শাহ্‌ তাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন।

সারেমোল দৌলাহ্‌ ইসফাহানের পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত নেতা হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি খুবই প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও ছিলেন বৃটিশদের একজন বিশ্বস্ত এজেন্ট। ইসফাহানের গভর্নর তার ইচ্ছানুসারে কাজ করতেন। যদিও শওকাত-আল্‌-মুলকের কোন রাষ্ট্রীয় পদবী ছিলনা কিন্তু সবাই তার মতামত নিয়েই কাজ করতেন। তিনি তার বাবা জেলাল সুলতানের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে ধনসম্পদের মালিক ছিলেন। তার ছেলে শাহ্‌'র আমলে তার সিভিল এডজুট্যান্টস নিযুক্ত হন এবং একজন রাজার মতোই দিনযাপন করতেন। ইসফাহানে তিনি একটা বিশাল কারখানা গড়ে তোলেন এবং তেহরানে অত্যন্ত চমৎকার একটি বাড়ি।

গিলান প্রদেশে (উত্তর ইরান) আকবর পরিবার ছিল বৃটিশদের সমর্থক। এ পরিবার রেজা শাহ্‌কে ক্ষমতায় আনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯২১ সনের

www.pathagar.com

অভ্যুত্থানের সময় বৃটিশরা ফাতোল্লাহ্ আকবরকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করে। এ পরিবারের অন্য সদস্য খান আকবর বৃটিশ দূতাবাস এবং রেজা শাহ্'র মধ্যে অন্যতম সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তার মৃত্যু পর্যন্ত শাহের কাছ থেকে অগাধ শ্রদ্ধা পেয়েছেন।

বৃটিশরা বখতিয়ারী গোত্রের উপরও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। আসাদ বখতিয়ার, জাফর বখতিয়ার এবং তাদের পিতা ও সন্তানগণ পুরোপুরিভাবে বৃটিশদের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন। শাহ্ সর্বদাই সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন যাতে বখতিয়ারীদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় থাকে। তিনি এমনকি বখতিয়ারী সম্প্রদায়ের কন্যা সুরাইয়াকে বিয়ে করে বখতিয়ারীদের সাথে সম্পর্ক রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। তিনি জাফর বখতিয়ারকে মজলিস ডেপুটি নিয়োগ করেন। রস্তাম বখতিয়ার রাজ দরবারের চীফ অফ প্রটোকল নিযুক্ত হন।

হামেদান এলাকায় বৃটিশরা ঘারাঘুঘলু এবং জাহেদী পরিবারের সমর্থন ভোগ করে। শাহ্'র শাসনামলে এ পরিবারদ্বয় খুবই উচ্চপদসমূহ লাভ করে। তারা ইরানের সর্বত্র অসংখ্য সমর্থক সৃষ্টি করেন যারা ব্যাপকভাবে ধনবান এবং ক্ষমতাধর ছিল। বৃটিশরা এবং এরা একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা রাখে।

বৃটিশরা ইরানের কিছু পরিপক্ক রাজনীতিবিদকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকেই সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীত্বের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করানো হতো। এ ধরনের "প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত" রাজনীতিবিদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। আসলে রেজা শাহ্ ক্ষমতায় আসার অনেক আগে থেকেই বৃটিশরা ইরানে ব্যাপক প্রতিপত্তি বিস্তার করে। বলশেভিক বিপ্লবের আগে সোভিয়েতেরা কাজাক বাহিনীর মাধ্যমে তাদের প্রভাব স্থাপন করে, কিন্তু বিপ্লবের পর তারা গোপনভাবে বিভিন্ন দল গঠনের মাধ্যমে এ প্রভাব অব্যাহত রাখে। বলশেভিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত শাসকরা তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে দারুণভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লে বৃটিশদের জন্য ইরানের অভ্যন্তরে একটি শক্তিশালী সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৃটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের মোক্ষম সুযোগ আসে। বৃটিশদের পক্ষে তাই ভূমিকা রাখার জন্য মোক্ষম সুযোগ আসে। বৃটিশদের পক্ষে এ ভূমিকা রাখার জন্য রেজা শাহ্কে নির্বাচন করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেনের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র আঞ্চলিক রাজনীতিতে প্রবেশ করে। বৃটিশরা এখানে তাদের প্রতিপত্তি ধরে রাখার চেষ্টা করে কিন্তু ক্রমশ বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে তাদের পক্ষে এ প্রতিপত্তি ধরে রাখা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

সেজন্যেই তারা মার্কিনীদের সাথে সমঝোতায় পৌছে। মার্কিনীরা ইরানের পেট্রোলিয়াম ইন্ডাষ্ট্রিসমূহের রাষ্ট্রীয়করণের স্বপক্ষে অবস্থান নেয় যাতে তারা বৃটিশদের সাথে মিলে ইরানের পেট্রোলিয়াম শিল্পে ভাগ বসাতে পারে। বৃটিশরাও এ বিষয়ে একমত হয়। ইরানী সেনাবাহিনীকে "পেট্রো-ডলারের" বিনিময়ে তারা অস্ত্র সস্ত্র ও যন্ত্রপাতির সিংহভাগ অংশই সরবরাহ করে। এ অবস্থা ইসলামী বিপ্লব সাধিত হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। ইতিমধ্যে ইরানে মার্কিন প্রভাব বাড়তে থাকে। আমেরিকান এজেন্টদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইরানের সামরিক বাহিনীও ব্যাপকভাবে মার্কিন নীতির সমর্থক হয়ে যায়। বৃটিশ নীতির সমর্থকের সংখ্যা কমতে থাকে। ইরানের সামরিক অফিসাররা মার্কিন অফিসারদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতো। ইরানে প্রভাব বজায় রাখার ক্ষেত্রে বৃটিশরা পুরোপুরিভাবেই মার্কিনীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যদিও মার্কিনী ও বৃটিশদের ভিন্ন স্বার্থ ছিল কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে তারা একে অন্যের পরিপূরক ও সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। আমার মতে, মার্কিনীরা বর্তমান বিশ্বে যা কিছুই করছে সব কিছুতেই বৃটিশদের সহায়তা আছে। বৃটিশরা সর্বদাই মার্কিন নীতিকে অনুসরণ করছে এবং মার্কিনীরাও বিশ্বব্যাপী বৃটিশদের স্বার্থ সংরক্ষণ করছে। এ কারণেই ইরানে বৃটিশ ও মার্কিন গোয়েন্দা এজেন্টদের চিহ্নিত করা অসম্ভব। অনেকে যদিও নির্দিষ্টভাবে বৃটিশ অথবা মার্কিনদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চ সামরিক ও বেসামরিক পদে অধিষ্ঠিতরা যৌথ শক্তির স্বপক্ষে শাহ্ প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার করে।

ইরানে সিআইএ ঃ

ইরানে স্পেশাল ব্যুরো অফ ইন্টালিজেন্স প্রতিষ্ঠার পর আমি তেহরানে মার্কিন দূতাবাসে সিআইএ'র ষ্টেশন প্রধান কর্ণেল ইয়াটসোভিকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখতাম। আমি বৃটিশ দূতাবাসে এম আই-৬ প্রতিনিধির সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করেছি।

কর্ণেল ইয়াটসোভিক মূলত যুগোশ্লাভিয়ায় একজন বৈমানিক ছিলেন যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে আত্মপক্ষ ত্যাগ করে বিমানসহ যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন এবং মার্কিন নাগরিকত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি নিশ্চিতভাবে গোয়েন্দা বিষয়ে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন ছিলেন তাই তিনি অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যেই ইরানে সিআইএ'র প্রধানে পরিণত হন যেটিকে খুব উচ্চপদ ধরা যায়। তিনি নিয়মিতভাবে ইরানের পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করতেন এবং তাদের জন্য পার্টি দিতেন। আমি আমেরিকান গোয়েন্দা অফিসারদের মধ্যে কর্ণেল ইয়াটসোভিকের মতো এতো সুদক্ষ, চতুর, কর্মক্ষম এবং প্রাণবন্ত মানুষ দেখিনি।

শাহ্'র শাসনামলে মার্কিন অথবা বৃটিশদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং যেকোন তথ্য প্রদান গুপ্তচর বৃত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো না। কিন্তু সোভিয়েতদের সাথে যেকোন

www.pathagar.com

হয় পাহ্লভী শাসকদের কাছে জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল ছিল নিরর্থক অথবা বিদেশী শক্তিরা রেজা খান ও তার ছেলে মোহাম্মদ রেজাকে যে ধরনের পরিকল্পনা দিত পাহ্লভীরা এটা অন্ধভাবে অনুসরণ করতেন। আর এ কারণেই পাহ্লভী শাসকদের "জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল" ইরানের আর্থ-সামাজিক-সংস্কৃতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে।

রেজা খানের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে তার কোন সমস্যা ছিলনা। এতদাঞ্চলের অতি ক্ষমতাধর শক্তি বৃটিশরা তাকে সমর্থন দিয়ে ক্ষমতায় বসায় এবং তার সমর্থক শক্তি হিসেবে শাসনকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সোভিয়েত সরকার যারা তখন খুবই দুর্বল ছিল, তারাও রেজা খানের নেতৃত্বে সমর্থন প্রদান করে এবং রেজা খানের শাসনামলে তারা কখনো বিরোধিতা করেনি। এ জন্যেই পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে রেজা খান তেমন কোন সমস্যা অথবা বিদেশী হুমকীর সম্মুখিন হননি। বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান না থাকার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের পক্ষাবলম্বন করেন। তার মানসিকতার সাথে হিটলারের ধ্যান-ধারণার যথেষ্ট মিল ছিল। কিন্তু হিটলার সমর্থন করায় বৃটিশরা তার প্রতি নাখোশ হয় এবং পরবর্তীতে রেজা খানের পতন হয়।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রেজা শাহ্ যে "অস্ত্রটি" ব্যবহার করেন সেটি হচ্ছে সেনাবাহিনী। তখন ইরানের ক্ষুদ্র জনসংখ্যার তুলনায় তিনি ১ লাখ সৈন্যের শক্তিশালী এক সেনাবাহিনী গড়ে তুলেন। পুলিশ বাহিনীকে তাদের নিয়মিত দায়িত্বের বাইরে যে কোন বিরোধী ব্যক্তি ও সংগঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহেরও বাড়তি দায়িত্ব দেয়া হয়।

রেজা শাহ্'র একটা কেন্দ্রীয় সরকার ছিল এবং তিনি তার প্রাসাদে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করতেন। মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক হতো নিয়মিত। তিনি মন্ত্রীবর্গকে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়মশৃংখলা নিশ্চিতের নির্দেশ দিতেন। মন্ত্রীদের তৎপরতা এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ড তিনি নিজে পর্যবেক্ষণ করতেন। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল সেনাবাহিনীর দু'টি ইউনিট। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সেনা ইউনিট এবং সরকারের তত্ত্বাবধান করতেন তিনি নিজে। রেজা শাহ্ তার দেশের পেট্রোলিয়াম খাত থেকে উপার্জিত অর্থের একটা বড় অংশ (৩২ মিলিয়ন পাউন্ড) প্রতিবছর সেনাবাহিনীর পেছনে ব্যয় করা হতো। দেশের অসামরিক উচ্চপদ ছিল প্রধানমন্ত্রী আর সামরিক উচ্চতম পদ সেনাবাহিনীর চীফ অফ ষ্টাফ এবং পুলিশ প্রধান।

পাহ্লভী রাজতন্ত্র, পরাশক্তি এবং মধ্যপ্রাচ্য ঃ

এ পর্বে আমি পশ্চিমা শক্তির ব্যাপারে ইরানের রাজনৈতিক কৌশল এবং এসব শক্তির ব্যাপারে রেজা শাহ্'র অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করবো।

www.pathagar.com

এসব তথ্য ইরানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ১৯ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে গৃহীত।

১। মোহাম্মদ রেজা'র কাছে অতি গোপনীয় মার্কিন মাসিক বুলেটিন সরাসরি আসতো। মোহাম্মদ রেজা এগুলো পড়ার পর বাক্সবন্দী অবস্থায় আমার কাছে পড়ার জন্য পাঠাতেন। আমি পড়ার পর এগুলো পুড়িয়ে ফেলা হতো। আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে ২০-৪০ পৃষ্ঠার এসব বুলেটিনে ব্যাপক তথ্য থাকতো।

২। বিশ্বের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইরান সম্পর্কে প্রকাশিত আর্টিকেলসমূহ সাভাক, সেন্ট্রাল ইন্টালিজেন্স ব্যুরোতে পাঠাতো। আমি এসব পড়ে দেখতাম।

৩। সেনাবাহিনীর মূল সপ্তম বিভাগ ও দ্বিতীয় বিভাগের মাসিক বুলেটিন আমি পরীক্ষা করতাম।

৪। ইরান সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন বেতার মাধ্যমে প্রচারিত তথ্যসমূহের রেকর্ডকৃত টেপ পরীক্ষার জন্য আনা হতো।

৫। বিভিন্ন ভোজসভা, মিটিং ইত্যাদিতে উল্লেখযোগ্য কোন কিছু ঘটলে এর তথ্যও আমি পেতাম।

৬। সুপ্রীম কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল এবং দ্বিতীয় সারির সমন্বয় কাউন্সিলের মিটিং চলাকালে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমার কাছে আসতো।

৭। সেনা সদর দপ্তরসমূহ সম্পর্কেও অতিরিক্ত তথ্যসমূহ আমার কাছে আসতো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনেক কিছুকেই পাল্টে দেয় এবং একটি নতুন আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করে। যদিও যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বৃটিশরা ছিল এক শক্তিশালী ঔপনিবেশিক শক্তি যাদের রাজ্যে সূর্যাস্ত হতো না; কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সে প্রেক্ষাপট পাল্টে দেয় এবং বৃটেন তার শক্তিশালী ভাবমূর্তি হারিয়ে ফেলে। লন্ডন তার যুদ্ধপূর্ব অবস্থান থেকে পশ্চাতধাবন করে এবং নয়া পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আপোষমূলক সম্পর্ক বজায় রাখে। এছাড়া আন্তর্জাতিক বিষয়ে খুব সীমিত কিন্তু ক্ষমতাশালী অবস্থান বজায় রাখে। যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপ পূর্ব ও পশ্চিম ব্লকে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

কেউ কেউ এমনটা বিশ্বাস করেন যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ওয়াশিংটনের একটা প্রতিপক্ষের প্রয়োজন ছিল আর সেকারণেই এরা মস্কোকে পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে। এর কারণ পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপস্থিতি পশ্চিম ইউরোপসহ বিশ্বের অন্যান্য এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যকে নিশ্চিত করবে। এখানে আমি এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করবো ঃ

www.pathagar.com

(ক) সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি মার্কিন সাহায্য প্রমান করে যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে এ সাহায্য দিয়ে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এক অবধারিত পরাজয় থেকে রক্ষা করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের চরম শীত হিটলারকে তার আগ্রাসন থেকে দমাতে সক্ষম হয়নি। জার্মানরা তীব্র ঠান্ডা সহ্য করতে সক্ষম ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের শক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে দশগুণ বেশি ছিল। আর এ করণেই সোভিয়েতরা মার্কিনদের সহায়তা না পেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দারুণ ভাবে জার্মানদের কাছে নাস্তনাবুদ হতো।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি মার্কিন সামরিক সহযোগিতা নিম্নোক্ত পন্থায় দুই পথে জাহাজীকরণ হয় ঃ

১। আধুনিক সামরিক সরঞ্জাম ইরান হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পথে জাহাজীকরণ করা হয় যার সাংকেতিক নাম "বিজয়ের সেতু" যা সোভিয়েত রেড আর্মির জন্য প্রেরিত হয়।

২। আরেকটি কনসাইনমেন্ট ইটালী হয়ে জাহাজীকরণ করা হয়। এছাড়া ফ্রান্সে মার্কিনীদের অধিকতর শক্তি প্রয়োগকে প্রতিহত করতে জার্মানরাও সেখানে অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপের অনেক স্থানেই সৈন্য সমাবেশ বৃদ্ধিতে বাধ্য হয়। যার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে তথা পূর্ব ইউরোপে জার্মান সৈন্য সংখ্যা হ্রাস পায়।

উপরোক্ত দু'টো ঘটনা উদাহরণ থেকেই বুঝা যায় মার্কিনীরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমুহ পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করে এবং ষ্ট্যালিন বহুবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ "অবদানের" কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেছেন।

(খ) ইয়াল্টা সম্মেলনে সোভিয়েতদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে রোজভেল্ট দ্বি-পরাশক্তির স্বীকৃতি দেন।

ইয়াল্টা সম্মেলনে ষ্ট্যালিন ও চার্চিল মুখোমুখি হন এবং রোজভেল্ট বৃটেনের মিত্র-শক্তি হওয়া সত্ত্বেও মধ্যস্ততাকারীর ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধে বৃটেন ছিল পরাজিত শক্তি। ইয়াল্টা চুক্তির ফলে বাল্টিক প্রজাতন্ত্রভুক্ত লিথোনিয়া, লাতভিয়া, এস্তোনিয়া এবং রোমানিয়ার কিছু অংশ সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশে পরিণত হয়। পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোস্লোভাকিয়া, রোমানিয়া এবং পূর্ব জার্মানী মস্কোর "প্রভাবিত রাষ্ট্রে" পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে রোজভেল্ট আকস্মিকভাবে ষ্ট্যালিনের প্রতি সমর্থন দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে মহা পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে "খেলতে" থাকে। যদিও দ্বিতীয় পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের আবির্ভাব হয় পুরোপুরিভাবে

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রেরই সার্বিক সহযোগিতায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পজাত পণ্যের মান যথেষ্ট উন্নত করার পর বিশ্ব-বাজারে এর কোন চাহিদা ছিল না। এক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র 'ত্রাণকর্তার' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ওয়াশিংটন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মস্কোর পণ্যসামগ্রী বিক্রির পথ করে দেয়। বিশ্ব বাজারে সোভিয়েত শিল্পজাত পণ্যের বাজারহীনতা সেদেশের শিল্পকে ধ্বংশ করে দিত, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "দয়া" সোভিয়েতদের অস্তিত্ব রক্ষায় সহায়তা করে এবং কমিউনিজমের দেশকে অভাব-অনটন, চরম দারিদ্র্যসহ নানাবিধ সমস্যার ব্যাপকতা বোধ করে। যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত সু-পরিকল্পিতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাশক্তি হিসেবে "সৃষ্টি" করে কেজিবি'র কল্পিত শত্রুতার বিরুদ্ধে লড়তে থাকে যার ফলে বিশ্বব্যাপী মার্কিন প্রভাবেরই বিস্তার ঘটে। এখানে আরেকটা কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব-নীতিতে যে বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে সেগুলো হলো; সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিপক্ষ শক্তি হিসেবে উপস্থাপন এবং সোভিয়েত চিন্তা-চেতনাকে প্রাধান্য না দিয়ে বিশ্বব্যাপী মার্কিন প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের পরিধি কতদূর ছিল ?

মার্কিন নীতি– নির্ধারকদের সু-নির্দিষ্ট মতবাদের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখন্ডে কোন সময়েই কোন যুদ্ধ বিস্তার লাভ করেনি। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখন্ডও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলীয় বন্দরগুলো জাপানীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল এ কারণেই যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র নিজ ভূমিতে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। পশ্চিম ইউরোপকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব এলাকার সম্মুখবর্তী প্রতিরক্ষা "দেয়াল হিসেবে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় কিছু দ্বিপ, তাইওয়ান, ফিলিপাইনের মতো মার্কিন প্রভাবান্বিত কিছু রাষ্ট্রকে আমেরিকা'র পশ্চিমাঞ্চলীয় অগ্রবর্তী প্রতিরক্ষা দেয়াল" হিসেবে ব্যবহার করে। এসব এলাকাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ভূমি এবং প্রতিপত্তির এলাকা হিসেবে গণ্য করা হতো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসব অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রভাব বিস্তার করতে দিতনা। যদি আরো কোন যুদ্ধ বাধতো তাহলে উল্লেখিত রাষ্ট্রসমূহকে "বলির পাঠা" বানিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে রক্ষা করতো। আমেরিকান সৈন্যদের ঐসব দেশে পাঠানো হতো শত্রুদের সাথে লড়ার জন্য যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যুদ্ধ উপেক্ষা করা যায়। পশ্চিম জার্মানী ও জাপানকে আমেরিকানরা "মারাত্মক জাতি" হিসেবে গণ্য করতো। এ কারণেই এ দু'টি দেশের সামরিক শক্তির উপর যুক্তরাষ্ট্র চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করে এবং এদের অর্থনীতিতে

www.pathagar.com

প্রকার যোগাযোগ ছিল অবৈধ এবং এটা ছিল গুপ্তচর বৃত্তির পর্যায়ের। সোভিয়েতদের কাছে এমনকি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও সাধারণ্যে প্রকাশিত তথ্যের বাইরে যেকোন তথ্য দিলেই সেটাকে "অতি গোপন তথ্য" পাচার হিসেবে ধরা হতো এবং "পাচার কারীর" জন্য গুরুতর শাস্তির বিধান ছিল। সোভিয়েতরা অবশ্য এ "ডাবল ষ্ট্যানডার্ডের" ব্যাপারে কোন আপত্তি তুলতো না।

শাহ্'র নির্দেশে আমি সবসময়ই ইয়াটসোভিকের সাথে যোগাযোগ রাখতাম। কোন কোন সময় আমি তার বাসায়ও যেতাম। তার বাসা ছিল দারোস্ এলাকায় এবং এ বাসার সামনে ছিল বিশাল একটা বাগান। তার বাসায় প্রতি রাতেই যে পার্টির আয়োজন হতো এর মূল উদ্দেশ্য ছিল তথ্য সংগ্রহ। তার "অবসর গ্রহণের" পর একটি ভোজসভায় ইয়াটসোভিকের সাথে আমার দেখা হয়। এ পার্টিতে শাহ্ও উপস্থিত ছিলেন। আমি তাকে প্রশ্ন করি কেমন আছেন। তিনি বলেন, "এখন আমার কর্মস্থল গ্রীস, তবে ইরানে এখনো আমি কিছু দায়িত্ব পালন করছি।"

কর্ণেল ইয়াটসোভিক চলে যাওয়ার পর সিআইএ'র দুজন ষ্টেশন প্রধান ইরানে আসেন। আমি তাদের সাথেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখতাম।

রিচার্ড হেল্‌ম প্রথম যখন ইরানে আসেন তখন তিনি ছিলেন সিআইএ'র ডেপুটি ডিরেক্টর। পরবর্তীতে তিনি আসেন সিআইএ'র পরিচালক হিসেবে এবং সবশেষে ইরানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে। প্রথমবার তিনি যখন ইরানে আসেন তখন তিনি আমাকে বলেন যে তার ভাই সুইস স্কুল লে-রোসেতে শাহের সহপাঠি ছিল। তিনি আরো বলেন যে তার ভাইর কাছে কিছু ছবি আছে যেগুলো তিনি আমার মাধ্যমে শাহ্‌কে দেখাতে চান। পরবর্তীতে তার ভাই সস্ত্রীক ইরানে এলে রিচার্ড হেল্‌ম আমার সাথে দেখা করার জন্য এপয়েন্টমেন্ট চেয়ে ফোন করলে আমি তাদেরকে পরের দিন আমার সরকারী বাসভবনে আসতে বলি। তারা এসে আমার সাথে অনেকক্ষণ কথা বলে এবং লে-রোসেতে অধ্যায়নকালীন কিছু ছবি দেখান। ছবিতে শাহ্'র সাথে লে-রোসের শিক্ষার্থীদের মাঝে আমিও ছিলাম। রিচার্ড হেল্‌মের ভাইকে আমি জিজ্ঞেস করি তিনি শাহ্'র সাক্ষাৎ প্রার্থী কি-না। তিনি সাগ্রহে মাথা নাড়লে আমি প্রটোকল বিভাগের মাধ্যমে এপয়েন্টমেন্ট করে দেই।

ইরানে মার্কিনীদের গোয়েন্দা রাডার স্থাপন সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। শাহ্'র শাসনামলে মার্কিনীরা উত্তর ইরানে গোয়েন্দা রাডার স্থাপন করে। ঠিক কোন্ তারিখে রাডার স্থাপন করা হয় তা আমার জানা নেই, তবে ১৯৬১-তে আমি সাভাক (Savak)

www.pathagar.com

এর উপ-প্রধান থাকাকালে ঐসব রাডারগুলো সক্রিয় ছিল। ইরানের একজন গোয়েন্দা অফিসার আমাকে বলেন যে উত্তর ইরানে স্থাপিত এসব রাডারের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের গোটা দক্ষিণাঞ্চল কভার করা যেত। শক্তিশালী এ রাডারের রেঞ্জ ছিল ৫ হাজার কিলোমিটার। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কান্‌গারলো আমার কাছে এ রাডার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন। ইরানের গোয়েন্দা বিভাগ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী আমেরিকান গোয়েন্দা রাডারসমূহ সম্পর্কে যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারি তা নিম্নরূপ ঃ

১। প্রতিটি রাডার ষ্টেশন ৫ হাজার কিলোমিটার এলাকা কভারের ক্ষমতাসম্পন্ন করে যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করা হয়। এগুলো যদিও মার্কিনীরা স্থাপন করে কিন্তু এর মূল্য ইরান পরিশোধ করে। অবশ্য পরে এগুলো ইরানের সম্পদে পরিণত হয়।

২। রাডার কেন্দ্রে ভূগর্ভস্থ অফিস ইত্যাদি মজবুত কংক্রিট গাথুনিতে নির্মাণ করা হয় যার নক্সা প্রণয়ন থেকে শুরু করে নির্মান পর্যন্ত সবই মার্কিনীরা করে, কিন্তু ইরান এসবের ব্যয় বহণ করে।

৩। প্রতিটি রাডার ষ্টেশনে ৩০—৪০ জন মার্কিন অফিসার কাজ করতেন।

৪। রাডার ষ্টেশন এলাকার ২০ হাজার বর্গ মিটার এলাকা কাটাতারের বেড়া দিয়ে সংরক্ষিত ছিল। এর অভ্যন্তরে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত মার্কিন বাহিনী সার্বক্ষণিক পাহাড়া দিত। কাটাতারের বেড়া ছিল ৬ ফুট উঁচু এবং রাতের বেলায় এতে এলার্ম সিস্টেম ব্যবহৃত হতো। রাডার ষ্টেশন এলাকায় সু-উচ্চ প্রহরা টাওয়ার ছিল।

৫। রাডার ষ্টেশনের যাবতীয় কর্মকান্ডের বিষয় সরাসরি মার্কিন দূতাবাসে জানানো হতো এবং ইরান কর্তৃপক্ষকে এসব বিষয়ে কিছুই জানানো হতো না।

উপরে যা কিছু বর্ণনা করলাম তা কেবল ইরানে সিআইএ কর্মকান্ডের কিয়দাংশ। তাদের বিস্তারিত কর্মকান্ড সম্পর্কে জানা সম্ভব ছিল না। তবে এককথায় এটুকু বলা যায় যে সিআইএ ইরানে ব্যাপক কর্মকান্ড বিস্তারে সক্ষম হয় এবং তারা ইরানে প্রতিটি পর্যায়ে পর্যাপ্ত প্রভাব বিস্তার করে। শাহ্'র শাসনামলে কোন ব্যক্তির পক্ষেই বৃটিশ ও মার্কিন দূতাবাসের অনুমোদন ছাড়া উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই যারাই বৃটিশ বা মার্কিনীদের সমর্থন লাভ করতো তারাই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত হতে পারতেন।

শাহ্'র শাসনামলে ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ছিল তৃতীয় ক্ষমতাধর শক্তি। মার্কিন এবং বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থার পর ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রমও ছিল যথেষ্ট বিস্তৃত। ইসরাইলী কর্তৃপক্ষ মনে করতেন যে তাদের দেশের অস্তিত্বের স্বার্থে

www.pathagar.com

পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র, যেমন মিশর, লেবানন, সিরিয়া, জর্দান, ইরাক এবং সৌদি আরব সম্পর্কে নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। মোসাদ কর্মকর্তার মতে যেহেতু ইহুদিরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাই তাদের কেউ কেউ তাদের বর্তমান আবাস দেশের গোয়েন্দা সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তার মতে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা।

১৯৬১ সনে আমি যখন সাভাক (Savak)-এ যোগদান করি তখন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলাভী কিয়া আমার সাথে ইয়াকুব নিমরোদী নামক এক ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দেন। সামরিক পদবীতে নিমরোদী ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল,যিনি ইরানে ইসরাইলের গোপন দূতাবাসের প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা প্রতি মাসে ইরানে তাদের কর্মতৎপরতা এতো নিখুঁতভাবে পরিচালনা করতে পারতো কারণ ইরানী সামরিক বাহিনীর বেশ কয়েকজন পদস্থ কর্মকর্তাকে তারা লাখ লাখ টোমান ঘুষ দিত।

ইরানের অভ্যন্তরে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা পরিচালিত কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য ছিল ইরাক এবং অন্যান্য আরব রাষ্ট্র। তারা ইরাক, কুয়েত, বাহ্‌রাইন, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে কিছু সংখ্যক এজেন্টও নিয়োগ করে। ইসরাইলীরা বিশেষ করে ইরাকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিত যার ফলে সে দেশের অভ্যন্তরীণ সব বিষয়ে সুক্ষ্মভাবে নজর রাখতো।

১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ইরানের অভ্যন্তরে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থার প্রকাশ্য কার্যক্রম বলবৎ ছিল। এরপর তারা ইরানের অভ্যন্তরে তাদের নিয়োগকৃত প্রায় ৩০০ এজেন্টের মাধ্যমে পূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করতো।

পাহ্‌লভী রাজতন্ত্রের গোয়েন্দা সংস্থা ঃ

রেজা শাহ্ ক্ষমতা দখলের পর, সম্ভবত বৃটিশদের পরামর্শে, পুলিশকে ইরানের বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর নজর রাখার নির্দেশ দেন। পুলিশ যথেষ্ট দক্ষতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করতে থাকে। ইতিমধ্যে পুলিশ বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য সেনাবাহিনীর জি-২ বিভাগকেও দায়িত্ব দেয়া হয় যারা ইন্টালিজেন্স এবং কাউন্টার ইন্টালিজেন্সের কাজটি করে। রেজা শাহ্'র শাসন সময়ে বাছাই করা কয়েকজন ফরাসী অফিসার ইরানী গোয়েন্দা সংস্থার ট্রেনিং প্রদান করেন।

সেনাবাহিনীর জি-২ বিভাগটিকে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থারও কিছু চৌকষ অফিসার প্রশিক্ষণ দিতো। ইরান যেহেতু মার্কিন নীতির কট্টর সমর্থক ছিল তাই মার্কিনীরাও চাইতো

www.pathagar.com

ইরানের একটা শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা গড়ে উঠুক যাতে এর অভ্যন্তরে সোভিয়েত শক্তির যেকোন "অপপ্রয়াশ" সম্পর্কে ইরানের গোয়েন্দা বাহিনীও তথ্য সংগ্রহ করে মার্কিন সিআইএ-কে প্রয়োজনে সংগৃহীত তথ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হয়। ইরানী গোয়েন্দা সংস্থার কর্মরত অনেক অফিসারই তাদের চাকরীর মেয়াদ পূর্তির পর তাদের পদবী বলে উপার্জিত অবৈধ অর্থ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলোতে পাড়ি জমিয়ে বিত্ত-বিলাশের মাঝে তাদের অবসর জীবন যাপন করতেন।

বৃটেনে ৪ মাসের প্রশিক্ষণের পর ইরানের স্পেশাল ইন্টালিজেন্স ব্যুরো সংক্ষেপে এসআইবি প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে নিয়োজিত হই। সজাগ তদন্ত আর যাচাই বাছাইর পর আমি এ দপ্তরের কর্মচারীদের নিয়োগ প্রদান করি। এসব নিয়োগ হয় সামরিক সদস্যদের মধ্য থেকেই। তিন মাসের টানা প্রচেষ্টার পর ১৯৫৯ সনে এসআইবি এর কার্যক্রম শুরু করে। এ প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি বিভাগ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতো। বিপ্লবের বছরেও ইরানের সিক্রেট সার্ভিসের বাজেট ছিল ৭.৫ মিলিয়ন রিয়াল।

ইরান শাহ্ শাসনামলে ইসরাইলকে অনানুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। তেল আবিব, তেহরানে একটি অঘোষিত দূতাবাস খোলে যারা মোহাম্মদ রেজার অনুমোদনক্রমে ইরানে গোয়েন্দা সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখতো। ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা বাছাই করা একদল অতি চৌকষ অফিসারের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণেই তেহরানে ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধির সার্বিক সহযোগীতায় গোয়েন্দা ট্রেনিং প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। সিআইএ এবং এমআই-৬ চাইতো মোসাদ যাতে ইরানে গোয়েন্দা সংস্থার প্রশিক্ষণে অধিকতর ভূমিকা রাখে যার ফলে নিজের অজান্তেই মুসলিম অধ্যুষিত ইরান ইহুদিদের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সিআইএ, এমআই-৬ আর মোসাদ একে অন্যের পরিপূরক শক্তি হিসেবে ইরানে তৎপরতা চালায়।

পাহ্লভী শাসন এবং জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল ঃ

প্রতিটি রাষ্ট্রেরই নিজস্ব নিরাপত্তা কৌশল থাকে যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র ও অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারীত হয়। কোন ক্ষেত্রেই দু'টো রাষ্ট্রের অভীন্ন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল থাকতে পারেনা, যদিনা তাদের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, নৃ-তাত্ত্বিক ও ভৌগলিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সামঞ্জস্য না থাকে। কিন্তু এটা কোন দেশের ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে এ কথা সহজেই বলা যায় যে বিশ্বে যতোগুলো রাষ্ট্র আছে ঠিক ততোগুলোই "জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল"ও আছে। একটি সরকারের স্থায়িত্ব অথবা পতন এটির উপর পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে।

www.pathagar.com

মার্কিন প্রভাব বিস্তার করে। এ দু'টি রাষ্ট্রকে যেকোন ধরনের কমিউনিষ্ট হুমকি থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

মার্কিন প্রভাবের পরবর্তী ক্ষেত্র ছিল কালো আমেরিকানদের দেশ অথবা অঞ্চলগুলো, যেগুলোতে রয়েছে বিস্তৃত প্রাকৃতিক সম্পদ। আমেরিকার বিশ্ব কৌশলে নীতি-নির্ধারকরা মধ্যপ্রাচ্যকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বদাই সজাগ ছিল পাকিস্তান, ইরানসহ পারস্য উপসাগরের তেলসমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলো যাতে কোনভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে পড়ে। এ অঞ্চলে ইরানকে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ করা হয়। পূর্ব ইউরোপে মস্কোর "সীমিত ভূমিকা"র বিষয়টি ছিল স্বীকৃত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ও সম্পদশালী রাষ্ট্রসমূহে এর আগ্রাসী পরিধি বাড়াতে থাকে। তবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্প্রসারণবাদী নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব-বিভাজন ফর্মূলাকে অনুমোদন করেনি। বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং ক্রমশ এর আদর্শিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আকাঙ্খা মস্কোকে বিশ্বব্যাপী মার্কিন প্রভাবের বিরুদ্ধে "লড়তে" বাধ্য করে। এর প্রথম উদাহরণ সোভিয়েত ইউনিয়নের ইরান অধ্যুষিত আজারবাইজান এবং গ্রীস আগ্রাসন।

বিশ্বযুদ্ধকালে এবং এর পর সোভিয়েত ইউনিয়ন গ্রীসকে এর ছাতাভূক্ত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এ লক্ষ্যে পৌছার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর গ্রীসের পাহাড়ী অঞ্চলে যা বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা, কমিউনিজমের বিস্তার ঘটানোর প্রচেষ্টা চালায়। সেই এলাকায় মস্কো ব্যাপক সামরিক সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়। সেসময়ে গ্রীসের কমিউনিষ্ট জনসংখ্যা ত্রিশ লাখের বেশি ছিল না। এ অঞ্চলের উপর পূর্বে বৃটেনের আধিপত্য হ্রাস পাওয়ায় লণ্ডন গ্রীসের ব্যাপারে ওয়াশিংটনের সহযোগিতা প্রার্থনা করে।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান, ষ্ট্যালিনের সাথে একটি সমঝোতায় পৌছেন যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র মস্কোকে এ সর্তে গ্রীসে এর আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ দেয় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরানের আজারবাইজান থেকে এর সৈন্য হটিয়ে নেবে। ইরান অধ্যুষিত আজারবাইজান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তর চাপ প্রয়োগ করে যার ফলে ষ্ট্যালিন উত্তর গ্রীসে সামরিক সহযোগিতা হ্রাসে বাধ্য হন। এভাবে ওয়াশিংটন গ্রীস পরিস্থিতিকে আয়ত্তাধীন করে। গ্রীসে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার পর সেখানকার কমিউনিষ্টদের দমন করা হয়। সামরিক শক্তি নিয়ে গ্রীসে যে রাজতান্ত্রিক সামরিক সরকারকে ক্ষমতাসীন করা হয় এর দৃশ্যত ক্ষমতাধারী যদিও রাজা ছিলেন কিন্তু

www.pathagar.com

বাহ্যত এর ক্ষমতায় ছিল সেনা অফিসারবৃন্দ। যখন মার্কিনীরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হলো যে গ্রীসে আর কমিউনিষ্টদের কোন প্রভাব নেই তখন এটিকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেয়। গ্রীসের পরিস্থিতি ইরানের মতোই ছিল। সোভিয়েতরা ইরানেও ব্যর্থ হয় এবং আজারবাইজান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে বাধ্য হয়। অপরদিকে মার্কিনীরা ইরানে ক্রমশ এদের প্রতিপত্তি বাড়াতে থাকে এবং সামান্যতম সোভিয়েত প্রভাবের আশঙ্কাকেও ধ্বংশ করে দেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মোহম্মদ রেজার প্রতি সমর্থন প্রদান এবং মার্কিন নীতি নির্ধারকদের কাছে ইরানের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কারণ নিম্নরূপ ঃ

১। এ অঞ্চলে কমিউনিজমের বিস্তার হ্রাস এবং মস্কোর কর্তৃত্বকে বাধা দেয়ার ক্ষেত্রে ইরানকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বেষ্টনী হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ইরানের ২,২০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিশাল সীমান্ত আছে। এ কারণেই পারস্য উপসাগর পর্যন্ত পৌছার যেকোন সোভিয়েত বাসনাকে বাধাগ্রস্থ করার মোক্ষম ক্ষেত্র ছিল ইরান। এতদাঞ্চলে ইরান ছিল একটি ষ্ট্র্যাটেজিক রাষ্ট্র যার মাধ্যমে কমিউনিজমের সম্প্রসারণকে প্রতিহত করা হয়।

২। ইরান একটি তেলসমৃদ্ধ দেশ যার আরো অনেক মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। একারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নকে এসব প্রাকৃতিক সম্পদে ভাগ বসানোর সুযোগ দেয়া সম্ভব ছিল না।

৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপ এবং জাপানের জন্য ইরান ছিল এ এলাকা থেকে প্রাকৃতিক তেল আমদানীর দ্বার স্বরূপ। সে সময় প্রতি বছর হরমুজ এলাকা দিয়ে ২৭ মিলিয়ন ব্যারেল তেল আমদানী হতো যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ এলাকাকে এর করায়ত্তধীন রাখার ব্যাপারে ছিল বদ্ধপরিকর। পশ্চিমারা আরো উপলব্ধি করতো যে ইরানে সোভিয়েতপন্থী সরকার ক্ষমতায় বসলে সেখানে তাদের স্বার্থ ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন হবে। এবং পশ্চিমা অর্থনীতিতে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

উপরোক্ত কারণসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এবং এর মিত্র শক্তিসমূহকে ইরানে শাহ্‌কে ক্ষমতায় রেখে সোভিয়েত আগ্রাসন রোধ ও ইরানের তেল সম্পদ ভোগের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী করে তোলে।

বৃটেন আফগানিস্তান ও ইরানে ব্যাপকভাবে সক্রিয় ছিল যাতে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, কাশ্মীর এবং শ্রীলংকায় সোভিয়েত প্রভাবের বিস্তার না ঘটে।

বৃটিশরা আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তানে অথবা ইরান হয়ে পাকিস্তানে যে কোন ধরনের সোভিয়েত আগ্রাসন দমনের ব্যাপারে সর্বদা প্রস্তুত ছিল। এক্ষেত্রে ওয়াশিংটন সামরিক

www.pathagar.com

ব্যবস্থা গ্রহণেরও প্রস্তুতি রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েতরা এ অঞ্চলে প্রভাব বৃদ্ধির ব্যাপারে আগ্রহী হয় এবং এ লক্ষ্যে মস্কো এখানে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করে। সোভিয়েতরা সেসময়কার আফগান নেতা মোহাম্মদ জহির শাহ্‌কে হাত করে এবং উত্তর ও দক্ষিণ আফগানিস্তানের মধ্যে একটি মূল সংযোগ সড়ক নির্মাণ করে; যার ফলে পারস্য উপসাগরে সোভিয়েতদের জন্য নির্বিঘ্নে প্রবেশের পথ খুলে যায়। ক্রমান্বয়ে আফগানিস্তানে সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে এরা এদের নিজস্ব পদ্ধতিতে আফগান সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে থাকে এবং মস্কো সেখানে প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়। এটা পরিষ্কার যে সোভিয়েতরা আফগানিস্তানে যা কিছুই করে, এর পেছনে মার্কিন সম্মতি ছিল। ওয়াশিংটন চাইতো মস্কো যাতে আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করেই এ অঞ্চলের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। অপরদিকে চতুর মার্কিনীরা প্রায় নির্বিঘ্নে এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে ফেলে এবং ইরানের উপর ব্যাপক আধিপত্য স্থাপনের মাধ্যমে তেলসমৃদ্ধ ইরানের কাছ থেকে পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন করে।

সোভিয়েতরা যখন নিশ্চিত করে বুঝতে পারলো যে আফগানিস্তানে পশ্চিমা অথবা মার্কিন প্রভাব বিস্তারের কোন সম্ভাবনা নেই, তখন তারা জহির শাহ্‌কে ক্ষমতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেয়। মস্কো চাইছিলো আফগানিস্তানে সর্বত্র এর প্রভাব বিস্তার করতে আর এ লক্ষ্যেই জহির শাহ্‌কে তার ইতালী সফরের সময় একটি অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করে। এ অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন শাহ্‌'র ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং একসময়কার প্রধানমন্ত্রী দাউদ খান। দাউদ ছিলেন একজন সোভিয়েতপন্থী নেতা এবং তার প্রধানমন্ত্রীত্বকালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে আফগানিস্তানে ব্যাপকভাবে প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ করে দেন। কাবুল অভ্যুত্থান ও ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে তেহ্‌রানে কোন বার্তা পাওয়া যায় নি। পরবর্তীতে খবরটি কাবুলে অবস্থিত দূতাবাসের মাধ্যমে তেহ্‌রানে পৌঁছায়।

পরবর্তীতে আফগান প্রেসিডেন্ট খাঁন বিদেশ সফর থেকে মস্কো হয়ে ফিরে আসার পথে জানতে পারেন যে তার শাসনামলে কারাবন্দী বিরোধী কমিউনিষ্ট নেতা নুর মোহাম্মদ তারাকী ক্ষমতা দখল করেন। এ অভ্যুত্থানের পরিকল্পনায় ছিলো পদস্থ সোভিয়েত অফিসাররা এবং অনেক নিপুণতার সাথে এ অভ্যুত্থান ঘটানো হয়। একজন আফগান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন যাকে পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। এ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল দুই ব্যাটালিয়ান সৈন্যসহ প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে হামলা চালান এবং প্রেসিডেন্ট খাঁন নিহত হন। তার স্ত্রী ও কন্যা

www.pathagar.com

পালিয়ে যেয়ে কাবুলস্থ ফরাসী দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সৈন্যরা তাদের পিছু ধাওয়া করে দূতাবাসেও হামলা করতে উদ্যাত হলে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের তীব্র প্রতিবাদের মুখে সৈন্যরা ক্ষান্ত হয়। রাষ্ট্রদূতের পতাকাবাহী গাড়ীতে খাঁনের স্ত্রী ও কন্যাকে পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করা হয়। নিহত প্রেসিডেন্টের সব সমর্থককে হত্যা করা হয় এবং সফল এ অভ্যুত্থানের সংবাদ রেডিওতে প্রচার করা হয়। রাত তিনটায় সফল অভ্যুত্থানের পর সকাল আট'টায় নূর মোহাম্মদ তারাকী তার মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। অভ্যুত্থানে ছয় শ সৈন্য নিহত হয় এবং পরবর্তীতে তেহরানে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এটা ছিল খুবই সফল ও নিখুঁত অভ্যুত্থান। তারাকী'র সরকার বেশি দিন ক্ষমতায় টিকে থাকেনি এবং তারই মন্ত্রী পরিষদ সদস্য হাফিজুল্লাহ্ আমিন তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাষ্ট্র ক্ষমতার ভার গ্রহণ করেন। আমিন ছিলেন খুবই উচ্চাভিলাষী। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি পশ্চিমা দেশসমূহে বিশেষ দূত প্রেরণ করেন কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে। এ বিষয়টা সোভিয়েতদের কাছে ফাঁস হয়ে গেলে তারা আফগানিস্তানে সৈন্য প্রেরণ করে এবং হাফিজুল্লাহ্ আমিনকে ক্ষমতাচ্যুত করে বিরোধী "ফ্ল্যাগ পার্টির" নেতা বাবরাক কারমালকে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করে। তারাকী এবং আমিন উভয়েই বাবরাক কারমালকে চেকোস্লোভাকিয়ায় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করেন যাতে তিনি কাবুলের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে থাকেন। "ফ্ল্যাগ পার্টির" নেতা-কর্মীদের অধিকাংশ ছিলেন "ফার্স" গোত্রভুক্ত এবং তারা সবাই কট্টর কমিউনিষ্ট ছিলেন। বাবরাক কারমাল অথবা হাফিজুল্লাহ আমিনকে সোভিয়েতরা যখন ক্ষমতায় বসায় তখন তাদের দল মোটেও জনপ্রিয় ছিলনা। বরং তাদের সমর্থকের সংখ্যা বড়জোর দু'হাজার ছিল।

আমার বিশ্বাস আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে রাজনৈতিক খেলা খেলে এর পেছনে নিশ্চিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নীরব সমর্থন ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আফগানিস্তানে সম্প্রসারণবাদ চালায় তখন মার্কিনীরা গোপনে একে সমর্থন দিয়ে প্রকাশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতা করতে থাকে। যার ফলে সমগ্র বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। এছাড়া আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরোধিতা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম যুদ্ধে তাদের যে ভাবমূর্তি হারায় তা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। ক্রমান্বয়ে মার্কিনীরা ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে শক্তিশালী 'বেইস" গড়ে তোলে এবং সোভিয়েতের উন্নতিশীল অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেয়।

আফগানিস্তানের অর্থনীতির অন্যতম ক্ষেত্র হলো মাদক ব্যবসা। আফিমসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচারের "সেইফ রুট" হিসেবে বিবেচিত হয়। ইরানে পাচার হয়ে আসা

www.pathagar.com

আফিমসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য আফগানিস্তান রুটে আসতো। ইরানের একজন সিনেটর ডাঃ জাহান শাহ্ সালেহ্ আফিম চাষ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। আন্দোলনের নেতারা দাবী করেন যে আফিম চাষের ফলে ইরানী জনগণ মাদকাশক্ত হয়ে পড়ছে। আসলে এ আন্দোলনের পেছনে ছিল মার্কিন ইন্ধন। ইরানে আফিম চাষ বন্ধ হওয়ায় আফগানিস্তান ও তুরস্ক থেকে আফিমের চালান ইরানে পাচার হতে থাকে যার বিনিময়ে ইরান থেকে পাচার হয়ে যায় স্বর্ণ মুদ্রা। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় ইরানে আফিম চাষ নিষিদ্ধ হওয়ার পর এর ব্যবহার অন্তত তিন গুণ বেড়ে যায়।

ভারত বিভক্তির মাধ্যমে পাকিস্তানের জন্ম হয়। দেশটির ধর্ম ইসলাম। এছাড়াও এর নাগরিকদের মধ্যে জাতিগত ও ভাষাগত সামঞ্জস্য আছে। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তানের জন্মের আগে মুসলমানরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কিন্তু ইসলামী আদর্শই এদেরকে একতাবদ্ধ করে। পাকিস্তানে বিদ্যমান অসংখ্য জাতিসত্তার কারণে প্রায়শই সেখানে জাতিগত বিরোধ দেখা দিত যার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার চাপের মুখে থাকতো। পশ্‌তু এবং বালুচরা জাতিগত সম্প্রদায় হিসেবে শক্তিশালী ছিল। পশ্‌তুরা তুষারাচ্ছন্ন এলাকাতেই প্রধানত বসবাস করতো বলে তারা ছিল সবল এবং সাহসী। এরা নিজেদেরকে অন্য জাতিসত্তার চেয়ে "আর্য" জ্ঞান করে। জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁন পশ্‌তু সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। বালুচ সম্প্রদায় যারা প্রধানত পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বাসিন্দা, এরা দারুণভাবে স্বাধীনচেতা এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো'র সরকারের জন্য বেশ সমস্যা সৃষ্টি করে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর করাচী শহর যা খুবই জনবহুল তা রাজধানীতে পরিণত হয়। আদ্র আবহাওয়ার কারণে করাচী শহরের অধিবাসীরা ভারী কাজের প্রতি বিমুখ এবং কিছুটা অলস। এখানকার বাসিন্দারা দারুণ দারিদ্র্যে ভুগতেন। অনেকেই সড়ক পার্শ্বস্থ ফুটপাতেই ঘুমোতেন এবং অর্ধাহারে অনাহারে কষ্ট করতেন। পরবর্তীতে সরকার ইসলামাবাদকে রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন যদিও তখন এটি ছিল প্রায় গ্রামের মতো। ধীরে ধীরে সরকার ইসলামাবাদকে আধুনিক শহরে পরিণত করতে থাকে। পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় শহর ইসলামাবাদের আবহাওয়া চমৎকার এবং পর্বতবেষ্টিত এ শহর যেন প্রাকৃতিকভাবে নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঘেরা।

পাকিস্তান যখন বৃটিশ শাসনাধীনে ছিল তখনই এর অর্থনৈতিক অবকাঠামোগুলো গড়ে উঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং ওয়াশিংটনের অর্থনৈতিক সহযোগিতা পাকিস্তানী রাজনীতিকদের সমর্থন লাভে

www.pathagar.com

সক্ষম হয়। ক্রমান্বয়ে মার্কিনপন্থী রাজনীতিবিদ ও সেনা অফিসাররা পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করে নেয়। পাকিস্তানে রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম বা আইন না থাকায় যে কোন রাজনীতিবিদ সহজেই রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারতেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপল্স পার্টি ছিল পাকিস্তানের সু-প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতেই রয়ে যায়। সেনা সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লাখ। সেনাবাহিনী সামরিক সরঞ্জামের অভাবে ভুগতো এবং ইরানের সহযোগিতার উপর দীর্ঘ সময় যাবত নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

যুক্তরাষ্ট্র চাইতো পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী যাতে দক্ষিণ এশিয়ায় ওয়াশিংটনের স্বার্থ রক্ষা করে এবং আফগানিস্তান সীমান্ত দিয়ে যে কোন ধরনের সোভিয়েত আগ্রাসন প্রচেষ্টাকে যেন প্রতিহত করে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হচ্ছিল তখন জেনারেল আইউব খাঁন ক্ষমতা দখল করেন। পরবর্তীতে জুলফিকার আলী ভুট্টো আমেরিকার সম্মতিক্রমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু কিছুকাল পরই সে সময়কার সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউল হক, ভুট্টো সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করেন এবং একজন রাজনীতিবিদকে হত্যার অভিযোগে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ফাঁসিতে ঝুলান। আমি অবশ্য ভুট্টোর পতনের যথার্থ কারণ জানিনা কারণ তার দল তখনও জনপ্রিয় ছিল। ভুট্টোকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ক্ষেত্রে জিয়াউল হক যে কারণ দেখান সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়; বরং আমার মনে হয় এর পেছনে অন্য কোন কারণ ছিল। আমার ধারণা ভুট্টো সোভিয়েতদের কাছে গোপন কোন দলিল হস্তান্তর করে দেন এবং সম্ভবত তিনি এজন্য ঘুষও গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক অপরাধেই ভুট্টোর ফাঁসি হয় বলে আমি ধারণা করছি যদিও আমার ধারণার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই।

ভুট্টো যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তখন থেকেই মোহাম্মদ রেজা এবং আশরাফ তার সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ভুট্টো প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষী ছিলেন এবং রাষ্ট্রপতির পদটি আয়ত্ত করার জন্য তিনি সবধরনের চেষ্টাই করেন। শাহ্ও অর প্রতি সহযোগিতার হাত প্রশারিত করেন যাতে ভুট্টো তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পারেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হলে বালুচিস্তান প্রদেশে ব্যাপক সংঘাত-সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। বালুচিস্তানের গোত্রীয় নেতাদের নেতৃত্বে সেখানে সেনাবাহিনীর প্রবেশ পথ বাধাগ্রস্থ করা হয়, সৈন্য বহনকারী ট্রেন আক্রমণ করা হয়, এবং সেনা সদস্যদের উপর হামলা চালানো হয়।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ রেজা ইরানের বালুচিস্তান এলাকাতেও একই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা বিস্তার লাভ করার ভয়ে পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশের গভর্ণর জেনারেল বোজেনযোকে তেহরানে রাষ্ট্রীয়ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে এনে তাকে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন যাতে ইরান অধ্যুষিত বালুচিস্তান এলাকায় সংঘর্ষ না ছড়ায়। বোজেনযো, শাহ্'র প্রস্তাবে রাজী হন এবং জিয়াউল হক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ভুট্টো সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা পর্যন্ত ইরানের সাথে সহযোগিতা করেন। অভ্যুত্থানের পর বোজেনযোকে তার পদ থেকে হটিয়ে দিয়ে বালুচিস্তান প্রদেশে সেনাবাহিনী প্রবেশ করলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত হয়।

যেহেতু ইরান ও পাকিস্তানের গোয়েন্দা সার্ভিসের মধ্যে উচ্চপর্যায়ে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল তাই সাভাক'র জন্য পাকিস্তানে গোপন গোয়েন্দা তৎপরতা চালানোর প্রয়োজন হয়নি।

জিয়াউল হক ক্ষমতা দখলের পর ইরানে দশ বারের বেশি সফরে আসেন এবং শাহ্'র কাছ থেকে ব্যাপক আর্থিক ও সামাজিক সাহায্য লাভ করেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, পাকিস্তানের প্রতি ইরানের সামরিক সাহায্যের মধ্যে ছিল খুচরা যন্ত্রাংশসহ বেশ কিছু বিমান এবং ট্যাংক। পাকিস্তানের প্রতি ইরানী সহযোগিতা মূলত মার্কিন ও বৃটিশ পরামর্শেই প্রদত্ত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর "অতোমান" রাজতন্ত্রের পতনের পর তুরস্কের জন্ম হয়। এ রাজতান্ত্রিক পতন রাশিয়ায় বলশেভিক অভ্যুত্থানের সমসাময়িক। সেসময়কার একক সুপার পাওয়ার বৃটেন তিনটি রাষ্ট্রের প্রতি বিশেষ নজর দেয় যাতে সোভিয়েতরা ভূমধ্যসাগর এবং এশিয়ার বৃটিশ কলোনীতে প্রবেশ না করতে পারে। এ দেশ তিনটি হলো ইরান, পোলান্ড এবং তুরস্ক। ইরানে বৃটিশরা রেজা শাহ্‌কে দিয়ে ক্ষমতা দখল করিয়ে পাহ্‌লভী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করায়, পোলান্ডে মার্শাল পিল্‌সুদমকীকে প্রেসিডেন্ট পদে বসানো হয় এবং তুরস্কে ক্ষমতাসীন করা হয় কামাল আতাতুর্ককে। "আতাতুর্ক" সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হিসেবে ক্ষমতায় আসেন। গ্রীসের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি খ্যাতি অর্জন করেন এবং সেনাবাহিনী ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণে। ক্ষমতায় আসার পর তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা শুরু করেন। তুরস্ককে ইউরোপীয় দেশ সদৃশ করার লক্ষ্যে তিনি সে দেশে মহিলাদের হিযাব প্রথা নিষিদ্ধ করেন, ধর্মীয় নেতাদের ব্যাপক অপদস্থ করেন এবং নাগরিকদের ইউরোপীয় অনুকরণে পোশাক পরতে বাধ্য করেন। ইরানেও একই ঘটনা ঘটে। আতাতুর্ক কুর্দিদের উপর ব্যাপক

www.pathagar.com

নির্যাতন চালান এবং হাজার হাজারকে হত্যা করেন। তিনি "কুর্দি" উপাধি ব্যবহার নিষিদ্ধ করে এদেরকে "পাহাড়ী তুর্কী" নাম দেন।

-আতাতুর্ক ছিলেন একজন সেনা অফিসার তাই তাকে সহায়তা করার জন্য বৃটিশরা ইসমত ইনোনোকে প্রথমে তার সেনাপ্রধান এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। বৃটিশরা বিশ্বাস করতো যে, ইনোনো ব্যতিরেকে আতাতুর্ক রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যার ফলে তার শাসনের সমাপ্তি ঘটতে পারে। ইসমত ইনোনো অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করেন এবং আতাতুর্কের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে দীর্ঘ সময় থাকার পর ৯০ বছর বয়সে ইনোনো মারা যান। ইরানের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা তাদের তুরস্কীয় "কাউন্টার পার্টি" এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তুরস্কীয়রা বলতো কামাল আতাতুর্ক মদ্যপ ছিলেন এবং প্রতিরাতেই মাতাল অবস্থায় বিছানায় যেতেন। তার জন্য প্রতি রাতে তার প্রাসাদে অবস্থানরত সুন্দরীদের একজনকে শয্যাসঙ্গী হতে হতো। এভাবেই জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত আতাতুর্ক অতিবাহন করেন। ইসমত ইনোনো অবশ্য খুবই বিশ্বস্ততার সাথে আতাতুর্কের ব্যক্তিগত চাহিদাগুলো পুরণ করেন এবং এসব গোপনও রাখেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার চাইছিলেন তুরস্ক জার্মানীর পক্ষাবলম্বন করুক এবং এ লক্ষ্যে তিনি তুখোড় কূটনীতিক ভোঁন পোপেনকে তুরস্কে জার্মানীর রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেন। কিন্তু জার্মান প্রচেষ্টার মুখেও তুরস্ক নিরপেক্ষতা বজায় রাখে যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র এ দেশটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। তুরস্ক যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী দেশ তাই পশ্চিমা দেশগুলো এটিকে ব্যাপক অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করে। তুরস্কের ন্যাটো (NATO) সদস্যপদ প্রাপ্তির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তুরস্কের অভ্যন্তরে সামরিক স্থাপনাসহ শক্তিশালী রাডার স্থাপন সম্ভব হয়। দেশটির অবস্থানগত সুবিধার কারণেই ন্যাটো তুরস্কের জন্য পাঁচ লাখ সদস্যের শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ার ব্যাপক সহযোগিতা করে। তুরস্ক যদিও একটি দরিদ্র রাষ্ট্র কিন্তু আমেরিকার ব্যাপক সাহায্য এর বিশাল সেনাবাহিনী রক্ষাকে সম্ভব করে তোলে।

মোহাম্মদ রেজা'র শাসন ইসরাইলকে একটি ডিফেকটো (DEFECTO) সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ায় ইসরাইলের পক্ষে বেসরকারীভাবে তেহরানে তাদের দূতাবাস খোলা সম্ভব হয়। ইসরাইলের সাথে ভাল সম্পর্ক থাকার কারণে মোহাম্মদ রেজা ইরানের সীমান্তবর্তী কিছু স্থানে ইসরাইলকে পরিদর্শন বেইস প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেন যার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর উপর ইসরাইলী গোয়েন্দারা নজর রাখতে পারতো এবং বিভিন্ন

www.pathagar.com

বিষয়াবলী পর্যবেক্ষণ করতো। ইরান যেহেতু মুসলিম রাষ্ট্র তাই মোহাম্মদ রেজা প্রকাশ্যে একে স্বীকৃতি দেয়ার সাহস করেননি। যুক্তরাষ্ট্র বা বৃটেনও চায়নি যে ইরান এমনটা করুক। কারণ ইসরাইল ও আরবদের মাঝে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে ইরানকে "সংযোগকারী" হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মূল বেইস হলো ইসরাইল। ইসরাইলের অস্তিত্বের কারণেই তেলসমৃদ্ধ আরব রাষ্ট্রসমূহকে তাদের পেট্রো-ডলারের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়ে অস্ত্র ক্রয় করতে হয়। পশ্চিমা বিশ্বের ইউরোপীয় দেশসমূহও আরব বিশ্বের কাছ থেকে একই পন্থায় মুনফা অর্জন করে।

এটাই সত্য যে ইসরাইলই বিশ্বে একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইহুদিদের যে জনগোষ্ঠী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তারা যথেষ্ট প্রভাবশালী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদই ইহুদিদের দখলে।

সাভাক (SAVAK)-এর একটি রিপোর্টে দেখা যায় ইরানে ইহুদি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সত্তর হাজার। ইসরাইল প্রতিষ্ঠার আগে ইহুদি জনগোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় ছিল। তাদের মূল মনযোগ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যে। ইরানে বসবাসকারী ইহুদিদের মাঝে ঐক্য ছিল অন্যসব ইহুদিদের মতোই তীব্র। তারা নিজ সম্প্রদায়ের বাইরে কোন বৈবাহিক সম্পর্ক করতো না। বাহাই বা খৃষ্টান সম্প্রদায় যারা ইরানে অন্য ধর্মের লোকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এদের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী, তাদের মতো ইহুদিরা নয়। ইরানে বসবাসরত ইহুদিরা ইসরাইলে পাড়ি জমাক এটা ইসরাইল কর্তৃপক্ষ কখনো চাইতো না। এর কারণ, ইসরাইলে বসবাসরত ইহুদিরা সবাই শিক্ষিত এবং সম্পদশালী যারা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ থেকে ইসরাইলে আসে। পক্ষান্তরে ইরানের ইহুদি সমাজ ছিল দরিদ্র এবং অধিকাংশই অশিক্ষিত। ইরানের ইহুদি সম্প্রদায় ইসরাইলে প্রবেশের অনুমতি চাইলে ইসরাইল দু'টি সর্ত আরোপ করে। এক, এদেরকে ইসরাইলে বিনিয়োগ করার মতো পর্যাপ্ত বিত্তের অধিকারী হতে হবে অথবা সেনাবাহিনীতে কাজ করার মতো মানসিকতাসহ বয়সে তরুণ হতে হবে। এসব সর্ত পূরণ সাপেক্ষে কেউ-কেউ ইসরাইলে পাড়ি জমান এবং দু-তিন বছর পর কয়েকজন ফিরেও আসেন। আমার বিশ্বাস এরা ইসরাইলে গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ নেয়ার পর আবার ইরানে ফিরে আসেন যাতে ইরানের অভ্যন্তরে থেকে ইসরাইলী পারপাস্ সার্ভ করতে পারেন।

তেহরানস্থ ইসরাইলী দূতাবাসের নানাবিধ কর্মকান্ড ছিল। গোয়েন্দা কার্যক্রমের পাশাপাশি এটি ইহুদিদের মনস্তাত্ত্বিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক মিটিং

www.pathagar.com

ইত্যাদির আয়োজন করতো। মাঝে-মধ্যে দূতাবাস ভোজসভার আয়োজন করতো যেখানে বিদেশী কুটনীতিক, ইহুদি এবং ইরানী কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হতো। এছাড়াও ইসরাইলে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য ইরানী কর্মকর্তাদের ইসরাইলে প্রায়শই আমন্ত্রণ জানানো হতো। ইসরাইল ভ্রমণ শেষে ফিরে এসে অফিসাররা যে রিপোর্ট পেশ করতেন সেটি আমার ডেস্কেও আসতো।

ইরাকের ভূমি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশদের দখলে ছিল। ইরাকের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং বিশাল তেল সম্পদ বৃটিশদেরকে ইরাকে এদের অবস্থান নিশ্চিত করতে আগ্রহী করে তোলে। তারা হোসেন শরীফ মক্কা'র ছেলে ফয়সলকে ইরাকে এবং তার ভাই আব্দুল্লাহ্‌কে জর্দানের ক্ষমতায় বসায়। বাদশাহ্‌ আব্দুল্লাহ্‌ জর্দানের বাদশাহ্‌ হোসেনের দাদা। এটা লন্ডনের সিদ্ধান্তেই হয় কারণ তারা চায় এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশরা বাগদাদের উপর প্রভাব বৃদ্ধি করে এবং ১৯৫৪ সালে মার্কিনীদের সহায়তায় বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া পর্যন্ত বৃটিশ প্রভাব বলবত থাকে। বাগদাদ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে ইরাক প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

ইতিমধ্যে ইরাকে বৃটিশ বিরোধী জনমত গড়ে উঠতে থাকে। আফগানিস্তানের জেনারেল নজিবুল্লাহ্‌ এবং মিশরে কর্ণেল আবদুল নাসেরের সামরিক অভ্যুত্থান ইরাকী সেনাবাহিনীকেও অভ্যুত্থানের উদ্বুদ্ধ করে। মিশরে কর্ণেল নাসেরের অভ্যুত্থান আরব জাতিয়তাবাদী সেন্টিমেন্টকে উশকে দেয় এবং রাশিয়ানরা একে ইন্ধন দিতে থাকে। ১৯৮৫ সনে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল করিম কাশেম অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইরাকে ক্ষমতা দখল করেন এবং রাজতান্ত্রিক শাসন খশে পড়ে।

কাশেম ক্ষমতা দখলের একদিন পর চার তারকা জেনারেল জাম আমাকে বলেন, তিনি যখন সেন্টোতে (CENTO) ইরানের প্রধান প্রতিনিধি ছিলেন তখন কাশেম তুরস্কের একটি সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছিলেন এবং ইরাকের প্রতিনিধি হিসেবে সেন্টো'র মিটিং-এ যোগ দিতেন। জাম, কাশেমকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন এবং বলেন যে কাশেম খুবই আত্মপ্রত্যয়ী অফিসার। ইরাকের অভ্যুত্থান এ অঞ্চলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা মোহাম্মদ রেজা'র শাসনকেও শংকিত করে তোলে। কাশেমের অভ্যুত্থানকে সোভিয়েতপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ এর ফলে ইরাকে কমিউনিষ্ট তৎপরতা বৃদ্ধি এবং মার্কিন স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করে। এদিকে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরান ও জর্দানকে মদদ দিতে থাকে এবং এরই পাশাপাশি ইরাকের

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীতে প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা চালায় যাতে সাদ্দাম হোসেন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আসতে পারেন। চার বছরের মাথায় আরেফ, কাশেমের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং তাকে হত্যা করেন। এটা ছিল মার্কিন স্বার্থ সিদ্ধির পথে প্রথম পদক্ষেপ। ১৯৬৮ সনে প্রখ্যাত ফরাসী সাংবাদিক এবং "রে-মোন্‌ডে" পত্রিকার সম্পাদক তার "মার্কিন সাম্রাজ্য" শীর্ষক গ্রন্থে লিখেন ঃ কাশেম অধ্যাদেশ- ৮০ জারির মাধ্যমে ইরাকী তেল কোম্পানীর ৯৫ ভাগ শেয়ার সরকারের কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়ায় ওয়াশিংটন এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এ প্রতিবাদের ফলে ইরাক "বাগদাদ চুক্তি" থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়। ১৯৬৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে সিআইএ'র সহায়তায় আরেফ অভ্যুত্থান করেন এবং কাশেমকে ক্ষমতাচ্যুত ও হত্যা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য এ অভ্যুত্থানের সাথে সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেনি। কিন্তু ১৯৭৫ সনে সিনেটের কাছে এ বিষয়টা পরিস্কার হয়ে যায় যে সিআইএ কাশেমকে হত্যা ও ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র আঁটে।

১৯৬৬ সনে আরেফ একটি বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন এবং তার ভাই আব্দুর রহমান রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সনে হাসান আল্-বাকর আব্দুর রহমানকে জোরপূর্বক দেশ ছেড়ে বৃটেনে পাড়ি জমাতে বাধ্য করেন এবং ক্ষমতা দখল করেন। বৃটেনে আব্দুর রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা প্রমাণ করে যে তিনি আসলে বৃটিশ এজেন্ট ছিলেন। ইতিমধ্যে সাদ্দাম হোসেন বিপ্লবী কাউন্সিলের সেক্রেটারী ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। ক্রমশ ইরাকী সেনাবাহিনীতে সাদ্দাম হোসেনের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং রাষ্ট্রীয় সব কর্মকান্ডে ব্যাপক প্রভাব বিস্তৃত হয়। আমার কোন সন্দেহ নেই যে সাদ্দাম হোসেনকে একজন স্বৈরাচারী হিসেবে আবির্ভূত করানোর ষড়যন্ত্র অনেক আগে থেকেই নেয়া হয়। যখন আল্ বাকের রাষ্ট্রপতি তখন হঠাৎ করেই সাদ্দাম হোসেন ইরাকের সর্বোচ্চ সামরিক পদবী চার-তারকা জেনারেলের পোশাকে আবির্ভূত হন। তিনি এ পোশাকে সামরিক বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করেন। সাদ্দাম হোসেন একজন বেসামরিক ব্যক্তি ছিলেন এবং তার সামরিক পোশাক পরিধানে বেশ কিছু সেনা অফিসার ক্ষুব্ধ হন এবং প্রতিবাদ স্বরূপ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করেন।

মার্কিনীরা কেন ১৯৭৫ সনে কুর্দি বিদ্রোহ দমনের আহ্বান জানায়; কেন মোহাম্মদ রেজাকে ইরাকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরে উৎসাহিত করে ? কেন এবং কার পরামর্শে মোহাম্মদ রেজা আল্-বাকের-এর পরিবর্তে সাদ্দাম হোসেনের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেন ? সব প্রশ্নেরই জবাব খুব সোজা। যতক্ষণ না সিআইএ'র পছন্দের লোক সাদ্দাম হোসেন পর্যাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী হননি, মোহাম্মদ রেজা বাগদাদ সরকারের বিরুদ্ধে কুর্দি

www.pathagar.com

বিদ্রোহকে সমর্থন প্রদান করেন। কুর্দিরা মারাত্মক হুমকি হিসেবে বিবেচিত হতো এবং ইরাকী সেনাবাহিনীর এক তৃতীয়াংশের সমর্থন লাভ করে। ১৯৭৫ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে কুর্দি বিদ্রোহের ইতি টানার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আলজেরীয় প্রেসিডেন্ট বওমেদিয়েন'র মধ্যস্থতায় মোহাম্মদ রেজা এবং সাদ্দাম হোসেনের মধ্যে বিখ্যাত ১৯৭৫ চুক্তি স্বাক্ষর করায়। এ চুক্তি ইরাকী সেনাবাহিনীর কাছে সাদ্দামের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে উন্নিত করে এবং সেনাবাহিনী সাদ্দাম হোসেনকে তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে গণ্য করতে থাকে।

সাদ্দামের মার্কিনমুখী ভূমিকা আবারো ধরা পড়ে যখন ইরাক-সিরিয়া মৈত্রীর ব্যাপারটা সামনে আসে। এটা মনে করা হয় যে, আল্-বাকের এ উদ্যোগের পক্ষে ছিলেন যার কারণে সিরীয় প্রেসিডেন্ট হাফিজ-আল্ আসাদ বাগদাদ সফরে যান। এটা পরিস্কার যে ইরাক-সিরিয়া ঐক্য সোভিয়েত স্বার্থকে রক্ষা করে যার ফলে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র এ চুক্তির বিরোধিতা করে। তেহরানে বৃটিশ দূতাবাসে গোয়েন্দা সংস্থা এম আই-৬ প্রতিনিধি আমাকে বলেন যে, বৃটেন স্বাধীন ইরাকের ধারণার স্বপক্ষে ছিল এবং ইরাক-সিরিয়ার কোন "কুটুম্বিতার" বিরোধিতা করতো। মার্কিন ইশারায় সাদ্দাম এ চুক্তির সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করে দেন এবং প্রেসিডেন্ট আসাদকে "শূন্য হাতে" বিমান বন্দরে বিদায় জানান। পরবর্তীতে সাদ্দাম আল্-বাকেরকে শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে গৃহবন্দী করেন এবং সিরিয়াপন্থী নেতাদের হত্যা করে ১৯৭৮ সনে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। ঘটনার দ্রুত পরিণতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে ইরাকের ঘটনাবলীর পেছনে পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সক্রিয় ছিল।

১৯৭৫ সনের পর সফলভাবে কুর্দি বিদ্রোহ দমনের পর কমিউনিষ্ট পার্টি সদস্যদের দমন করতে থাকেন। ইরাকে কমিউনিষ্টরা শক্তিশালী ছিলনা যার ফলে এরা সরকারের সাথে সমঝোতার উদ্যোগ নেয়।

এ বছরগুলোতে ইরাক এর বাজেটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সামরিক খাতে বরাদ্দ করে। ১৯৭৮ সনের মধ্যে দুর্বল ইরাকী সেনাবাহিনীকে আট ডিভিশন সৈন্য, তিন ব্রিগেড স্বতন্ত্র ডিপার্টমেন্ট এবং ৭৫ হাজার সামরিক ব্যক্তির এক সেনা-শক্তি গড়ে তোলে যা ছিল ইরানের সামরিক বাহিনীর প্রায় অর্ধেক। ইরাক আরব দেশগুলোর মধ্যে ইসরাইলের বিরুদ্ধে কঠোরতম কট্টরপন্থী অবস্থান নেয় এবং আরব জাতির জন্য প্রয়োজনে আত্মাহুতির ভান ধরে যাতে প্রয়োজনীয়তা অর্জন করে।

১৯৭৮ সনে ক্ষুদ্র আরব রাষ্ট্রগুলো ইরাকের শক্তিকে ভয় করতো তবে আরব

www.pathagar.com

দেশগুলোর মধ্যে ইরানকে ইরাকীরা যথেষ্ট সম্মান করতো। ইরাক কুয়েত অধ্যুষিত বাব্ইয়ান দ্বীপ দাবী করলে কুয়েত ও অন্যন্য আরব রাষ্ট্রসমূহ তা প্রত্যাখ্যান করে। কয়েক বছর পর কুয়েত কর্তৃক বাব্ইয়ান দ্বীপ সংক্রান্ত দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ইরাক দ্বীপটি ভাড়ায় নিতে চায়। কুয়েত এবারও ইরাকের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে দু'টি দেশের মাঝে সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি ঘটে। বাব্ইয়ান দ্বীপটি ইরাকের খুবই কাছে অবস্থিত এবং ইরাকের পক্ষে মাত্র সেতুর মাধ্যমেই এটিকে দখল করা সম্ভব ছিল।

১৯৭৮ সনে মোহাম্মদ রেজা'র পতনের পর ইরাক অত্র অঞ্চলের অধিকতর বর্ধিত শক্তি হিসেবে আরব রাষ্ট্রসমূহে সোভিয়েত আগ্রাসনের সব পথকে রুদ্ধ করে এবং ইসরাইলের বিরুদ্ধে বলীষ্ঠতম শক্তি হিসেবে সুনাম অর্জন করে। আরব দুনিয়ার আরব জাতীয়তাবাদের বাণী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়ে এ অঞ্চলে ইসলামী বিপ্লবের সম্ভাবনাকে থমকে দেয়। এ অবস্থায় সউদি আরবের আর্থিক সহায়তায় সাদ্দাম হোসেন ইরান দখলের ব্যাপারে উৎসাহী হন। মার্কিন এবং পশ্চিমা ব্যাংকসমূহে সউদি আরব এখাতে ৯০০ বিলিয়ন ডলার জমা করে।

আমার মতে ইরাকের ইরান দখলের ফলে মার্কিনীদের নিম্নোক্ত সুবিধা হতো ঃ

১। ইরাকসহ এ অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রে ইসলামী বিপ্লবের পথ রুদ্ধ হতো।

২। ইরাকে শিয়া সম্প্রদায়ের উত্থান দমিত হতো।

৩। ইসরাইলের শক্তি বৃদ্ধি পেত, যার ফলে আরব রাষ্ট্রসমূহ এটিকে স্বীকৃতি দিতো।

৪। আরব দেশসমূহে ব্যয়বহুল অস্ত্র বিক্রী করা যেত।

৫। কয়েকটি আরব রাষ্ট্র, বিশেষ করে সউদি আরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাতকে অধিক মাত্রায় মার্কিন নির্ভরশীল হতে বাধ্য করতো।

৬। আরব দেশসমূহের মধ্যে ইরানের এবং শিয়া মতবাদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ করতো যার ফলে আরববিশ্ব ইসরাইল বিরোধী অবস্থান থেকে কক্ষচ্যুত হতো।

৭। মিশর পুনরায় আরব লীগে অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইরাকের ৩০০-৩৫০ জঙ্গি বিমান এবং প্রায় ১৮০০ সামরিক যানবাহন ছিল যা ইরানের চেয়ে সংখ্যায় কম (ইরানের ২৪০০ সামরিক যানবাহন ছিল)। তবে ইরাকী সেনাবাহিনী তাদের কমব্যাট প্রস্তুতিতে ইরানের চেয়ে এগিয়ে ছিল। এছাড়াও ইরাকের তিন ইউনিটের একটি আধা সামরিক বাহিনী ছিল যার দ্বারা শহরগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেত। মূল কথা হলো, আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ইরাকই সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অধিকারী ছিল।

www.pathagar.com

আমি আগেই বলেছি যে ১৯৭১ সনে শাহ্পার জে মোহাম্মদ রেজা সহ অন্যান্য ইরানী কর্মকর্তাদের জানান যে, যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটিশ সরকার চান ইরান যেন একটি শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

এরই প্রেক্ষিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে পরিবর্তনের ফলে ইরানের গোয়েন্দা সংস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আসে। ১৯৭১ সনে বৃটেন যখন এ অঞ্চল থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবে তখন তারা এ অঞ্চলের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব মোহাম্মদ রেজা'র উপর অর্পণ করে। এ সময়ে মোহাম্মদ রেজা নিজের ব্যাপারে বড় বেশি অহংকারী হয়ে উঠেন এবং আকস্মিকভাবে তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে ইরানের তেল খাত থেকে আয় পর্যাপ্ত পরিমানে বৃদ্ধি পায় যার ফলে মোহাম্মদ রেজার উচ্চাভিলাষও দ্বিগুণ হয়।

পারস্য উপসাগর থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের পর ওমানে যোফার বিদ্রোহীদের দমনের দায়িত্ব বৃটেন মোহাম্মদ রেজার উপর ন্যাস্ত করলে ইরান ১৯৭৩ সনে ওমানে সৈন্য পাঠিয়ে "যোফার লিবারেশন ফ্রন্ট"কে নির্মূল করে। ওমানে ইরানী সেনাবাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে এসআইবি (SIB)-কে কোন তথ্য দেয়া হতো না। সেনাপ্রধান নিজে সরাসরি মোহাম্মদ রেজাকে যোফার বিদ্রোহ সংক্রান্ত তথ্য এবং সেখানে ইরানী সেনাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত করতেন।

রাজতান্ত্রিক ওমান, যেটি একটি বৃটিশ কলোনী ছিল, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং ইয়েমেন সীমান্তবর্তী যোফার প্রদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলনে সমস্যা হয়ে পড়ে। দক্ষিণ ইয়েমেনের সরকারকে সোভিয়েতদের পুতুল সরকার মনে করা হতো এবং ওমান সেনাবাহিনী বিদ্রোহী দমনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বলশালী ছিলনা।

ওমানের ভৌগলিক অখন্ডতা রক্ষার দায়িত্ব ছিল বৃটিশদের উপর, কিন্তু এরা এদের সেনা উপস্থিতি তুলে নিয়ে নামমাত্র সেনা ওমানে রাখে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খাতামীর মতে, ওমানের সেনাপ্রধান ও পুলিশপ্রধান উভয়েই ছিলেন বৃটিশ এবং সুদক্ষ। কিন্তু তারাও ওমান ত্যাগ করেন। সুলতান কাবুতস- তরুণ ওমানি শাসক যিনি বৃটেনে শিক্ষাপ্রাপ্ত, লন্ডনের পরামর্শক্রমে মোহাম্মদ রেজাকে তার দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিরসনে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানান। শাহ্ তিন ব্রিগেড সৈন্য ও সরঞ্জাম পাঠিয়ে দেন।

বিপ্লব এবং রাজ্যতন্ত্রের পতন ঃ

১৯৭৮ সন, মোহাম্মদ রেজা'র শাসন শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল মনে হচ্ছিল। বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব শাহকে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে। এছাড়াও সোভিয়েতরাও তার শাসনকে স্বীকৃতি দেয় এবং আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ১৯৫৩

www.pathagar.com

থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত মোহাম্মদ রেজা ইরানের ক্ষমতাধর একনায়ক হিসেবে মার্কিন সহযোগিতায় নির্বিঘ্নে দায়িত্ব পালন করেন। আমি আগেই বলেছি, বৃটিশরা বিশ্বাস করতো যে ইরানের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে সেখানে স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক শাসনের প্রয়োজন। এ ধারণাটা বৃটিশ এবং বৃটিশপন্থী ইরানীদের মধ্যে ছিল।

এ কথা মনে করা হতো যে ইরানের ২,২০০ কিলোমিটার বিস্তৃত বিশাল সীমান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে থাকায় সেখানে কমিউনিষ্ট আগ্রাসন প্রতিরোধে একটি শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক স্বৈরশাসক প্রয়োজন। একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বামপন্থী প্রার্থীর সোভিয়েত সহায়তায় নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় এসে দেশটিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে ন্যস্ত করা সম্ভব। এমনটা না হলেও পশ্চিমা দেশগুলোকে ইরানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অর্থ যোগাতে হতো। কিন্তু রাজতান্ত্রিক শাসন এ ধরনের সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে। এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্র ১৯ আগষ্ট অভ্যুত্থানে মোহাম্মদ রেজার কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়ার পক্ষ নেয়। তা না হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সাথে দক্ষিণ আমেরিকা অথবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অনুরূপ নীতির অনুসরণে সেখানেও তৈমুর বখতিয়ারের মতো একজন স্বৈরশাসক বসিয়ে দেশ শাসন করাতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ পর্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ ইরাক, জর্দান ও সউদি আরবে রাজতান্ত্রিক শাসন কায়েম করা হয় এবং এক্ষেত্রে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনও লাভ করে।

মোহাম্মদ রেজা নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর রাজতান্ত্রিক শাসন দীর্ঘস্থায়ী হবে। ১৯৭০ সনে ফারাহ্, গোত্রপতি, জা'ম এবং সেনাপ্রধানকে লেখা এক চিঠিতে মোহাম্মদ রেজা জানান যে তার পরে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বে থাকবেন ফারাহ্। সে সময়ে তার ছেলে রেজা'র রাজদায়িত্ব নেয়ার মতো আইনগত বয়স হয়নি। সামরিক ও অসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়মিতভাবে শাহ্'র প্রাসাদে যেয়ে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে রেজা ও ফারাহ্কে অবগত করানোর নির্দেশ দেয়া হয়। রেজা অবশ্য এসব শোনার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু ফারাহ্ ছিলেন খুবই আগ্রহী। তিনি প্রশ্ন করেও অনেক বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতেন। এসব ব্রিফিংয়ের পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল ফারাহ্ ও রেজাকে তাদের ভবিষ্যত দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে ক্রমান্বয়ে প্রস্তুত করে তোলা। মোহাম্মদ রেজা তার উত্তরসূরী প্রশ্নে যথেষ্ট সন্দেহী ছিলেন, আর এ জন্যেই তার রাজতন্ত্রের ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানতার সাথে ব্যবস্থা নেন। পরবর্তীতে রেজাকে শিক্ষা লাভের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয় এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খাতামীকে তার সফরসঙ্গী করা হয়। ফিরে এসে খাতামী বলেন রেজা খেলাধূলার প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং একজন বৈমানিক হতে

www.pathagar.com

চান, কিন্তু মার্কিন অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ জানানো হয় তাকে রাজনীতি শেখানোর জন্য। ইরানে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হওয়ার পর রিচার্ড হেল্‌মকেও রেজাকে শিক্ষাদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সার্বিক পরিস্থিতিতে মোহাম্মদ রেজা এবং মার্কিন ও বৃটিশরা সন্তুষ্ট ছিলেন। কেবলমাত্র বিপ্লবের দু বছর পূর্বে একজন লেখক ইংরেজিতে লেখা একটি বইয়ে খুবই অবাকভাবে শাহ্'র পতন সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করেন। ১৯৭৯ সনে আমিসহ কেউই এ ভবিষ্যতবাণীকে পাত্তা দিইনি। একদিন রাতে বখতিয়ার মন্ত্রী পরিষদের শ্রমমন্ত্রী মানুচেহ্‌র আরইয়ানা আমার কাছে বইটা নিয়ে আসেন। আমি তাকে বইটার ইরান অধ্যায় খুব জলদি পড়ে শোনাতে বলি। শোনার পর আমি বলি, এ ভবিষ্যতবাণীকে বাস্তবে রূপ নেয়া হতে থামানো অসম্ভব। অবশ্য তখন সরকার খুবই স্থিতিশীল মনে হচ্ছিল এবং ভবিষ্যতবাণীগুলোকে বড়ই আশ্চার্যজনক লাগছিল।

১৯৭৭ সনে দায়িত্বশীল মহলগুলো একটি অত্যাসন্ন অভ্যুত্থান সম্পর্কে গুরুত্ববোধ করেননি এবং কোন সংস্থাই এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেননি অথবা বিপ্লব কিংবা অভ্যুত্থান দমনেরও ব্যবস্থা নেয়নি যতক্ষণ না সারাদেশে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক গোলযোগ সৃষ্টি হয়। পশ্চিমা দেশগুলো, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন দারুণভাবে বিশ্বাস করতো যে শাহ্'র সরকার খুবই স্থিতিশীল, এবং এ অঞ্চলে তার শাসনকে "স্থিতির দ্বীপ" বিশেষণ দেয়। বৃটিশ এবং মার্কিন দূতাবাসের কূটনীতিকদের সাথে কথা বলে আমি বুঝেছি যে শাহ্ শাসনের আসন্ন পতন আর অত্যাসন্ন বিপ্লব সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। এমনকি মার্কিন গোপন বুলেটিন, যা আমার কাছে আসতো সেটাতেও শাহ্'র পতন সম্পর্কে কিছুই ছিলনা।

১৯৭৬ সনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী জিমি কার্টার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। মোহাম্মদ রেজা'র ডেমোক্র্যাটদের সাথে ভাল সম্পর্ক ছিলনা। নির্বাচনের সময় শাহ্ রিপাবলিকানদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন যার ফলে ডেমোক্র্যাটদের বিজয় ইরানের প্রশাসনের জন্য সুখকর ছিলনা। এ সময়ে পশ্চিমা প্রেস এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলো শাহ্ প্রশাসনকে অত্যন্ত বাজেভাবে সমালোচনা করতে থাকে এবং সাভাক-এর নির্যাতনমূলক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। মোহাম্মদ রেজা'র সম্পর্কে বলা হয়, ইনি একজন বিত্তশালী প্রতারক-শাসক যিনি তার পেট্রো সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে পশ্চিমা গণতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করেছেন। এটা সুস্পষ্ট যে শাহ্ প্রশাসন পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। একারণেই প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার, শাহ্‌কে তাঁর ভাবমূর্তি ভালো করার পরামর্শ দেন।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্র চাইতো না যে ইরানের সরকার দুর্বল হোক অথবা মানবাধিকার লংঘনের দায়ে ধিকৃত হোক। মোহাম্মাদ রেজা তার ক্ষমতার জন্য ওয়াশিংটনের কাছে ঋণী ছিলেন, আর যুক্তরাষ্ট্র যখন চাইলো যে তিনি ইরানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার দিন তখন এটা না মানার আর কোন উপায় মোহাম্মদ রেজা'র কাছে ছিলনা। বৃটিশরাও মার্কিনীদের এ অভিব্যক্তির সমর্থন করে। তারাও চায় যে "স্থিতিশীলতার দ্বীপে" রাজনীতিতে বৈচিত্র্য আসুক। তৎকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব ডঃ আওয়েন ১৯৭৭ সনে ইরান সফরকালে মোহাম্মদ রেজাকে রাজনৈতিক সংস্কারের ব্যাপারে পুনরায় তাগাদা দেন। পরবর্তীতে শাহ্ সংস্কার পদ্ধতির প্রবর্তন করেন যার ফলশ্রুতিতে কার্টারের সাথে তার সম্পর্কের উন্নতি হয়। শাহ্ তার স্ত্রী ফারাহ্সহ যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন এবং ১৯৭৭ সনেই কার্টার সস্ত্রীক ফিরতী সফরে ইরান আসেন। তার সফরকালে কার্টার মধ্যপ্রাচ্যের অশান্ত পরিস্থিতির মাঝে ইরানী সরকারকে স্থিতিশীল এবং শাহ্কে "ভাল বন্ধু" বলে আখ্যায়িত করেন।

সফর আর পাল্টা সফরের ফলে সব ধরনের ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটে। কার্টারের মন্তব্যকে সম্মান দেখানো হয় তখনো যখন কয়েক সপ্তাহ্ পর কোন প্রদেশের বাসিন্দারা ফার্সী সংবাদপত্র "এট্টেল্লা এট"-এ ইমাম খোমেনীকে তিরস্কার করে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ প্রতিবাদের ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। সরকার ক্রমশ দুর্বল হয়ে যেতে থাকে কিন্তু তখনো ব্যাপারটা সরকার গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেনি। জনগণের প্রতিক্রিয়া এবং ব্যাপক বিক্ষোভকে চূড়ান্তভাবে অবহেলা করা হয় এবং পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মতো দায়িত্বশীল কোন দপ্তরও ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষায়তনসমূহও আকস্মিকভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠে যার ফলে সাভাক কমিউনিষ্টসহ বিরোধীদের উস্কানিমূলক কর্মকান্ডের জন্য গ্রেফতার করতে থাকে।

শাহ্'র পরিকল্পনাসমূহ গ্রামীণ অধিবাসীদের চূড়ান্তভাবে অবহেলিত করতে থাকে, এবং অলাভজনক ও ব্যয়বহুল প্রকল্পগুলো গুটিকয়েক মানুষের বৈভব বাড়িয়ে দেয় এবং দেশে মুদ্রাস্ফিতির জন্ম দেয়। ব্যয়বহুল প্রকল্পগুলো দেশের কৃষি উৎপাদন হ্রাস করে যার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ অধিবাসীদের কাজের সন্ধানে শহরে আসতে থাকে। এমনকি শহরেও, গুটিকয়েক ছাড়া, শ্রমিক, ঠিকাদার ও ব্যবসায়ীরা পরিস্থিতিতে দারুণভাবে নাখোশ হয়ে পড়ে। সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটতে থাকে। একই সাথে পাল্লা দিয়ে শাহ্'র যথেচ্ছ অপব্যয়, বিদেশী মেহমানদের পেছনে অকাতরে ব্যয় এছাড়াও মূল্যবান অস্ত্র-সস্ত্র ক্রয়ের ফলে অর্থনীতির উপর চরমভাবে চাপ পড়ে।

www.pathagar.com

১৯৭৩ সনে অপরিশোধিত তেলের মূল্য চারগুণ বেড়ে যাওয়ায় শাহ্ নিজেকে খুবই বিত্তবান আর ক্ষমতাবান ভাবতে থাকেন। কোটি কোটি ডলার অপচয় হতে থাকে। অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য দায়িত্বশীল কোন দপ্তর ছিলনা। আমি ইরানের গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হিসেবে মোহাম্মদ রেজাকে প্রকৃত অবস্থার কথা খুলে বলি। কিন্তু তিনি আমার কথায় কর্নপাত করেননি।

মোহাম্মদ রেজা আরো একটি বিষয় উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন আর তা হলো, দেশের অভ্যন্তরে ধর্মযাজকদের ক্রমাগত প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। ১৯৬৩ সনের ৫ জুনের পর সাভাক'র তৎকালীন প্রধান, মোকাদ্দাম সরকারকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করানোর ব্যবস্থা নেন। তিনি আদর্শিক স্কুলগুলোয় তথাকথিত উলামাদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ্ এবং প্রভাব বিস্তারের ব্যবস্থা করেন। যদিও শাহ্ নিজে এসব প্রতিষ্ঠানে ইমাম খোমেনী'র প্রভাব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন তবু তিনি ভাবেন ঘুষের বিনিময়ে তিনি ওলামাদেরকে প্রভাবিত করতে পারবেন।

কিন্তু সাভাকের প্রচেষ্টার বিপরীতে প্রকৃত অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ। ইরানের সাধারণ মানুষেরা ধর্ম যাজকদের কাছে তাদের সমর্থন সহযোগিতার জন্য দ্বারস্থ হচ্ছিল এবং অধিকমাত্রায় মসজিদ ও দরগাহ্মুখী হচ্ছিল। জনগণ সে সকল ধর্মযাজকেরই পক্ষাবলম্বন করছিল যারা তাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছিল, ঐসব যাজকদের নয় যারা সরকারের ভাষায় কথা বলছিলো। আপনারা জানলে হয়তো অবাক হবেন যে আমার চিন্তাধারাও সিংহভাগ জনগোষ্ঠীর অনুরূপ হয়ে পড়ে।

যখনই আমি জানতাম যে একজন ধর্মযাজক রেজা শাহ্'র সাথে দেখা করেছেন, আমি তখনি তাকে ঘৃণা করতাম। যেসব ধর্মযাজক মোহাম্মদ রেজা'র প্রতিনিধিদের সাদরে গ্রহণ করতো আমি তাদেরকে কখনোই হৃদয়ের গভীর থেকে শ্রদ্ধা করতে পারতামনা। শাহ্ নিজেও এদেরকে সম্মান করতেন না। কারণ তিনি জানতেন যে এরা তার চাটুকারিতা করছে এবং এরা খুবই সংকীর্ণমনা।

সাভাক'র হিসেব মতে ইরানে ধর্মযাজকের মোট সংখ্যা সাড়ে তিন লাখ। কোন শহরের সাভাক প্রধান বিশ্বাস করতেন যে আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী পবিত্র এ শহরে ব্যাপক আধিপত্য বিস্তার করেন। ধর্মযাজকরা ইরানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিলেন, এমনকি তারা এমন অজপাড়াগায়েও ছড়িয়ে পড়েন যেখানকার অধিবাসীরা শাহ্কেও চিনতো না। শাহ্পার জে ইতিপূর্বে স্বীকার করেন যে ইরানে কোন সরকারের পক্ষেই ধর্মযাজকদের সমর্থন ছাড়া টিকে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু মোহাম্মদ রেজা এটা মানতেন না। এ কারণে

www.pathagar.com

মার্কিন-বৃটিশরাও ভাবতো যে ইরানের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর পক্ষে একটা স্থিতিশীল সরকার নিশ্চিত করা সম্ভব।

বিপ্লব হঠাৎ করেই বিস্তার লাভ করে এবং অনেকেই এতে বিস্মিত হন। কিভাবে বিপ্লব সংঘটিত হলো ? আমি নিশ্চিত যে সাবেক কোন সরকারী কর্মকর্তাই এর জবাব দিতে পারবেন না, কারণ বিপ্লবের ব্যাপারটা ছিল ধারণারও বাইরে। আমিসহ কিছু সরকারী কর্মকর্তা উপলব্ধি করতে পারি যে নতুন কোন পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে কিন্তু তখনো তা পুরোপুরি ব্যাপৃত হয়নি। অন্য এক শ্রেণীর লোক বিশেষত সরকারী কর্মকর্তা তা ৎক্ষণিকভাবে বুঝতেই পারেননি যে কিছু একটা ঘটছিলো এবং যখন তারা বুঝতে পারেন তখন তারা বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজতে থাকেন।

কোন সরকারী কর্মচারীই দাবী করতে পারবেন না যে তারা বিপ্লবের ব্যাপারে আমার চাইতে বেশি অবগত ছিলেন। আমি সারা দেশ থেকে ব্যাপক সংঘর্ষ ও প্রতিবাদের অন্তত দশ হাজার অভিযোগ পাই যার সবগুলোই আমি শাহ্'র কাছে পাঠিয়ে দেই। কিন্তু এসব রিপোর্টে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এমনকি মার্কিন ও বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও আসন্ন বিপ্লবের ব্যাপারটাকে আমলে নেয়নি, অন্যথায় তারাও শাহ্কে আগাম হুশিয়ারী দিত।

আমি যখন এ বই লিখছি তখন গত পাঁচ বছরে বিপ্লব সাধিত হওয়ার পর থেকে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর ভিত্তি সুদৃঢ় করতে থাকে। ভবিষ্যতে বিপ্লবের ভিত্তি আরো শক্তিশালী হবে। ইরানের ইসলামী বিপ্লব ধাপে ধাপে সাধিত হয় যার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল।

বিপ্লব সর্বদাই রাতারাতি সাধিত হয় কিন্তু ইরানের বিপ্লব সাধিত হয় ক্রমান্বয়ে। ইরানের জনগণ বিপ্লবের জন্য সহিংসতার আশ্রয় নেননি। সাধারণত যারা বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন তারা মনে করেন বিপ্লব সাধনের কালবিলম্বিত হয়ে গেলে বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে; কিন্তু ইরানে বিপ্লব সাধিত হয় নয় মাসে! আমি কিন্তু অযাচিতভাবে বিপ্লবের প্রশংসা করছিনা।

শাহ্'র সাথে ইরাকের সম্পর্ক ছিল খুবই চমৎকার আর এ কারণেই তিনি ভাবেন, ইমাম খোমেনীকে নির্বাসনে পাঠালে তাঁর "গদি" কোনভাবেই হুমকির সম্মুখিন হবে না। কুয়েত, ইমাম খোমেনিকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং এর ফলে তাঁকে প্যারিসে পাঠিয়ে দেয়া হয়। খোমেনীকে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দিয়ে শাহ্ নিশ্চিত হন যে তাঁর সামনে আর কোন আসন্ন হুমকি নেই এবং ইমাম খোমেনীর তৎপরতা তিনি মার্কিন সহায়তায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এদিকে নিজ দেশে শাহ্ মার্কিন এবং বৃটিশদের পরামর্শে হাজার হাজার

www.pathagar.com

কাগজপত্র পূনর্বিবেচনার মাধ্যমে ক্ষিপ্ত জনমতকে প্রশমিত করার প্রয়াশ নেন। সরকারী কর্মকর্তারা শাহ্'র নির্দেশ পালন করেন কিন্তু এর ফলে ক্রমবর্ধিষ্ণু জনরোষ প্রশমিত হয়নি। দক্ষ রাজনীতিবিদ ও ইরানের প্রধানমন্ত্রী শরীফ ইমামী জনরোষ প্রশমিত করার আশায় মদ্যশালা ও জুয়াখানাগুলো বন্ধের নির্দেশ দেন; রাজকীয় ক্যালেন্ডারকে হিজরী ক্যালেন্ডারে পরিবর্তিত করেন এবং বেতন বৃদ্ধি করেন। কিন্তু শরীফ ইমামী'র প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং সাভাকের দপ্তরসমূহ থেকে আমি শত শত রিপোর্ট পেতে থাকি যেখানে প্রতিবাদ দাঙ্গা ও গোলযোগের খবর আসতে থাকে। তাৎক্ষণিকভাবে আমি শাহ্কে এসব বিষয় অবহিত করি।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শরীফ ইমামী'র প্রধানমন্ত্রীত্বে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিরসনে হতাশা দেখা দিলে তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁর পদত্যাগ গণরোষ ও বিপ্লবে নতুন মাত্রা যোগ করে এবং শাহ্ বিরোধী আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। সবশেষে রাজবংশের "শেষ রক্ষার" জন্য বখতিয়ারী দায়িত্ব নেন। কিন্তু তিনি একটি শর্ত দেন যে শাহ্ দেশত্যাগ করবেন। শাহ্'র কাছে এটাই একমাত্র পথ ছিল।

তখনো মার্কিন অথবা বৃটিশরা বিশ্বাস করতে পারেনি যে শাহ্'র শাসন পতনের কাছাকাছি এসে পৌছেছে। মোহাম্মদ রেজা এবং ইরানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মার্কিন প্রশাসন এবং কার্টারের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেন। বৃটিশ এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূতগণ সরকারকে বিদ্রোহ দমনে ব্যবস্থা নিতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু শরীফ ইমামী ও আজহারী'র প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে দ্রুত হটে যাওয়ার পর বৃটিশ ও মার্কিনীরা তাদের সিদ্ধান্তে কিঞ্চিত পরিবর্তন আনে। তারা তাঁকে সাময়িকভাবে ইরান ত্যাগের পরামর্শ দেয়। শাহ্ ভাবেন তিনি ইরানে পূনরায় ফিরে আসবেন কিন্তু আমি নিশ্চিত করেই জানতাম যে সেটা আর সম্ভব হবে না। মোহাম্মদ রেজার প্রস্থান সেনাবাহিনীর ও উর্ধ্বতন অফিসারদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়।

মার্কিনীদের পক্ষে শাহ্ প্রশাসনকে টেকানোর জন্যে ইরানে মার্কিন সৈন্য প্রেরণ কি সম্ভব ছিল? মোটেও না। ইরানে মার্কিন সৈন্যের "হস্তক্ষেপ" সোভিয়েতদের আগ্রাসনের পথকেই কেবল উন্মুক্ত করতো। মার্কিনীদের জন্য যেখানে ইরানে পৌছতে হলে কুড়ি হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হতো সেখানে মাত্র ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই সোভিয়েতদের পক্ষে ইরানে সৈন্য সমাবেশ ঘটানো সম্ভব ছিল। এসব প্রতিবন্ধকতার কারণেই মাত্র ৩৮ দিনের মাথায় প্রধানমন্ত্রী বখতিয়ারী'র সরকার পর্যুদস্ত হয়।

ইরানের ইতিহাস থেকে শাহ্ রাজবংশের রাজত্বের ইতি ঘটে। মোহাম্মদ রেজা

www.pathagar.com

চিকিৎসার অজুহাতে তেহরান ত্যাগ করেন এবং সবশেষে শাহ্ পার বখতিয়ারী'র সরকারও মাত্র ৩৮ দিনের মাথায় পতিত হলে ইরানে ইসলামী আন্দোলনের বিজয় পতাকা উদিত হয় এবং শাহ্ রাজবংশের বিদায় সূচিত হয়।

বিপ্লবের পর আমার জীবন ঃ

১৯৭৯ সনের ১১ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে আমার গাড়ীচালক দোস্তী আমাকে ডঃ অমিদের বাড়িতে নিয়ে যান এবং তখন থেকেই আমি গা ঢাকা দেই। কিন্তু আমার মনে হলো অমিদ আমাকে আশ্রয় দিয়ে ভীত হয়ে পড়েছেন। আমার অবস্থানের পঞ্চম দিনে একটি ফোন কলে সন্ত্রস্ত হয়ে অমিদ আমাকে বলেন নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা আমাকে খুঁজছে— আমি যেন অবিলম্বে তার বাড়ি ত্যাগ করি। আমার সন্দেহ হচ্ছিল যে আমাকে আসলে তার বাড়ি থেকে কৌশলে "তাড়ানোর" জন্যই অমিদ চাতুরী করেন।

এরপর আমি আমার বোন তুরানের বাড়িতে আশ্রয় নেই। তার স্বামী মোহাম্মদ আলী আফ্রাশতেহ্ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কয়েকদিন পর আফ্রাশতেহ্ ফোনে কারো সাথে কথা বলার পর আমাকে জানান যে কিছু লোক আমার সাথে কথা বলতে তার বাড়িতে আসছে। আমি অবশ্য টেলিফোন কথপোকথন শুনিনি কিন্তু বুঝা গেল ফোন রাখার পর আমার ভগ্নিপতি খুব বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং তার বাড়িতে আমার অবস্থানে তিনি অস্বস্তিবোধ করেন। আমি সেখান থেকে পালিয়ে ক্বারানী'র বাড়িতে আশ্রয় নেই। পরবর্তী দিনে আমি আফ্রাশতেহ্র বাড়িতে যাই এবং জানতে পারি যে কেউই তার বাড়িতে আসেনি। আমি নিশ্চিত হলাম অমিদ এবং আফ্রাশতেহ্ আমার সাথে মিথ্যা কথা বলেছেন।

কয়েকদিন পর আমি আমার ভাই নাসরোল্লাহ্'র আত্মীয় নাদেরের বাড়িতে প্রায় দুই সপ্তাহ অবস্থান করি। সেখানে আমি এত্তেলা'এত পত্রিকায় দেখি যে উচ্চ পদস্থ অফিসারদের মৃত্যুদন্ড দেয়া হচ্ছে যার মধ্যে শাহ্ প্রশাসনের ক্ষমতাধর হোভায়দাও আছেন। খবরটি আমাকে বড় বেশি বিচলিত করে তোলে এবং আমি বাজারগানকে একটা চিঠি লিখে আমার জীবন রক্ষা ও তার সাহায্য প্রার্থনা করি।

ঘড়ের মধ্যে থাকা আমার জন্য ছিল খুবই অসহনীয় এবং বিব্রতকর। নাদেরের বাড়ি থেকে আমি আমার বোন ইরানের আমন্ত্রণে তার বাড়িতে চলে যাই। বোনের বাড়ি আমিরাবাদে। মাঝে মধ্যে ইরান আমাকে একজন কর্ণেলের বাড়িতে নিয়ে যেত যিনি সামরিক একাডেমিতে শিক্ষকতা করতেন। কর্ণেলের স্ত্রী ছিলেন আমার স্ত্রীর আত্মীয়।

১৯৭৯ সনের মার্চ মাসে মরিয়ম আমাকে তার পরিবারের সাথে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানান। একদিন সে আমাকে জানায় যে তদন্তকারীদের লোকজন তাকে বলেছে যে আমি

www.pathagar.com

ইসলামী একটা সংগঠনকে সহযোগিতা করতাম। আমি মরিয়মকে বিয়ে করতে চাই এবং তদন্তকারী আমার সম্পর্কে যা বলছেন সে বিষয়ে নিরব থাকি। পরবর্তীতে মরিয়ম ইউরোপ ভ্রমণে যায় এবং তার বোনের পরামর্শে আমাকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের আশংকা ছিল যে আমি গ্রেফতার এবং নিহত হব।

আমি আহ্মদ আলী শিবানী এবং তার স্ত্রী পরিচেহ্র ও আমার ছেলে শাহ্রোখকে আমার দিনগুলোর কথা ও ঘটনাবলীর কথা জানাই। পরিচেহ্র আমার প্রাক্তন স্ত্রী এবং শাহ্রোখের মা। আমি তাদের সাথেও এক মাস তাদের ফ্ল্যাটে অবস্থান করি।

আমার সম্পর্কে যে গুজব ছড়াচ্ছিল এতে আমি আনন্দিত হচ্ছিলাম। কারণ এর ফলে আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা তাদের বাড়িতে আমাকে লুকিয়ে থাকতে দিতে উ ৎসাহিত বোধ করেন। বখতিয়ার রেডিও আমার সম্পর্কে গুজব ছড়াতে থাকে। বলা হয় আমি নতুন প্রশাসনের পক্ষে কাজ করছিলাম। এ প্রচারে আমি আনন্দিত হই। মার্কিন টিভি চ্যানেলকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে মোহাম্মদ রেজা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন আমি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি। নির্বাসিত শাহ্ এবং অন্যেরা আমার বিরুদ্ধে কি বলছিল তা নিয়ে আমি মোটেও উদ্বিগ্ন হইনি।

মিশরে মৃত্যুবরণের পূর্বে একজন বৃটিশ রিপোর্টারকে মোহাম্মদ রেজা বলেন যে আমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। শাহ্ ফরাসী ভাষায় লেখা একটি বইয়ে কারাবাক্কীকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করলেও আমার সম্পর্কে কিছুই বলেননি । সম্ভবত তিনি আমাকে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার দায়ে অভিযুক্ত করেন বলেই।

ধীরে ধীরে আমি পলাতক জীবন থেকে বাইরে আসতে শুরু করি এবং সময় কাটানোর জন্য লালেহ্ পার্কে যেতাম। সেখানে একজন ব্যবসায়ীর সাথে আমার পরিচয় হয় এবং পর্যায়ক্রমে আমি তাকে আমার প্রকৃত পরিচয় দেই এবং বলি যে নতুন প্রশাসন আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। সে আমার সাথে পার্কে আসা আরো বেশ ক'জনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। আমার মনে হলো আমার কথায় তাদের বিশ্বাস হয়েছে। বখতিয়ার রেডিওতে আমার সম্পর্কে যে অপপ্রচার চলতে থাকে তাতে আমার বিশেষ উপকার হয়। আমার ভাই'র স্ত্রী আমাকে তাদের বাড়িতে থাকার অনুমতি দেন অন্যথায় তিনি আমাকে একবেলা খাওয়ার দাওয়াত করতেও আগ্রহী ছিলেন না।

আমার পাঁচ বছরের পলাতক জীবনে স্ত্রী তা'লার সাথে টেলিফোনে নিয়মিত কথা বলেছি এবং তাকে ইরানে ফিরে আসতেও অনুরোধ করেছি। সে বলেছে, ইরানে সে আসতে পারে যদি সাভাক-এর উপদেষ্টা প্রকৌশলী আলী খানীকেও তার সাথে আসার

www.pathagar.com

অনুমতি দেয়া হয়। তালা মনে করে যে আমার, নতুন সরকারের উপরও যথেষ্ট প্রভাব আছে। আমি তাকে বলি যে, আলী খানীর ব্যাপারে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারবনা। কিন্তু বার বার এ ব্যাপারে চাপ দিতে থাকলে আমি তাকে ফোন করা বন্ধ করে দেই।

১৯৮০ সনে একটি সশস্ত্র গ্রুপ শাহ্নাজ এলাকায় আমার বাবার বাড়িতে যায় এবং আমার অবস্থান সম্পর্কে জানতে চায়। তারা আমার কয়েকটি বই নিয়ে যায় এবং পোশাক পরিহিত অবস্থায় আমার একটা ছবি চাইলে বাবা ছবি দিতে অস্বীকৃতি জানান। সে সময় আমি মরিয়মের বাড়িতে অবস্থান করছিলাম এবং সেই আমাকে উক্ত ঘটনা জানায়।

হামিদ নামে আমার একজন আত্মীয় মাঝে মধ্যে আমার সাথে দেখা করতেন। তিনি আব্বাস আবাদে নাসরুল্লাহ্'র ফ্ল্যাটে থাকতেন। সে খুবই চতুর ব্যক্তি ছিল এবং নতুন প্রশাসনের সমর্থক কিছু বন্ধুও ছিল।

---- ইঞ্জিয়ার বিপ্লবের ১৫ বছর আগে আমার বন্ধুতে পরিণত হন। তিনি বৃটেনে লেখাপড়া করেন এবং খুবই চালাক লোক ছিলেন। তিনি এবং তার বন্ধুরা মিলে বৃটেনে শিক্ষিত প্রকৌশলীদের একটি টিম গড়ে তোলেন এবং নিয়মিত এরা পার্টির আয়োজন করতো। আমি নিয়মিত তাকে ও তার স্ত্রীকে নৈশভোজে আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানাতাম। কিন্তু বিপ্লবের তিন মাস আগে থেকে তিনি আমার এখানে আসা বন্ধ করে দেন।

বিপ্লবের কিছুদিন পর আমি ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুটির বাসায় যাই। তারা আমাকে স্বাগত জানালেও ভেতরে-ভেতরে অখুশী হন। তার স্ত্রী আমাকে প্রশ্ন করেন, "নতুন প্রশাসনে আপনি একটা ভাল চাকরি করছেন ব্যাপারটা কি সত্যি?" আমি বললাম বলতে পারবনা। তখন তিনি ফের প্রশ্ন করলেন, "এটা কি সত্যি যে আপনি আশরাফের ছেলেকে (শাহ্'র ভাগ্নে খুন করেছেন?" আমি বললাম মনে পড়ছেনা। এরপর তিনি জানালেন যে কিছু অতিথি আসছে এবং তাৎক্ষণিকভাবেই আমি তাদের বাড়ি ত্যাগ করি।

www.pathagar.com

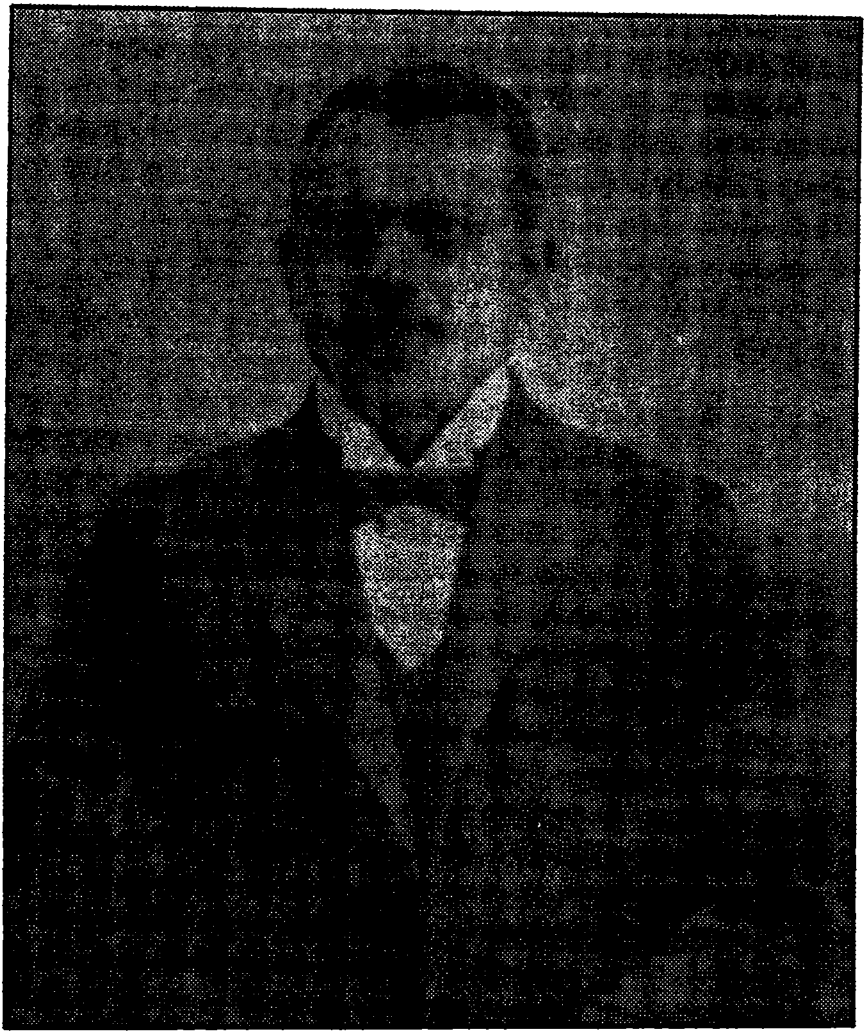

ইরানে অবস্থানকালে শুরুর বছরগুলোতে (১৮৯৩), আর্দেশীর জী।

www.pathagar.com

শাপুর (শাপুর জী). একজন মনস্তাত্বিক যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ হিসেবে রেডিও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকালে (রেডিও দিল্লীর ফার্সী অনুষ্ঠান – ১৯৪৪)।

www.pathagar.com

শাপুর জী, বৃটিশ সামরিক পোষাকে (১৯৬৯)

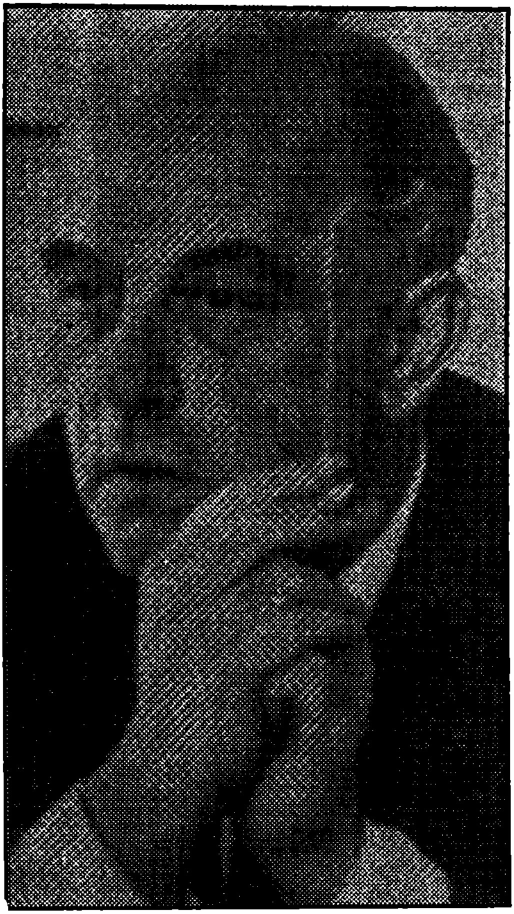
লর্ড নাথান মেয়ের ভিক্টর রথসচাইল্ড; ইহুদী গোয়েন্দা সংস্থায় শাপুরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং এমআই–৬-এর সাথে যোগসূত্র।

www.pathagar.com

মোসাদ্দেঘ-এর বিচার চলাকালীন অবস্থায় শাপুর জী। তার ব্যাক্তিগত এলবাম থেকে সংগৃহীত এ ছবিটির নিচের অংশে শাপুরের নিজ হস্তে লিখিত রয়েছে- "মিশন সমাপ্ত" (Mission Accomplished) ।

www.pathagar.com

শাপুর জী ও ইরানে নিযুক্ত বৃটিশ চার্জ দ্য এফেয়াস স্যার ডেনিস রাইট। ইরানের সাথে তেল কনসোর্শিয়াম চুক্তি সম্পাদনের জন্য রয়েল ডাচ শেল কোম্পানীর প্রেরীত প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জ্ঞাপন অনষ্ঠান চলাকালে (সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ তেহরান বিমান বন্দর)।

www.pathagar.com

উচ্চপদস্থ বৃটিশ গোয়েন্দা অফিসারদের সাথে শাপুর জী (প্রথম সারিতে ডানদিক থেকে প্রথম) এবং প্রথম সাভাক প্রধান তাইমুর বখতিয়ার (প্রথম সারিতে ডানদিক থেকে তৃতীয়) (লন্ডন, সেপ্টেম্বর ৯, ১৯৫৮)।

www.pathagar.com

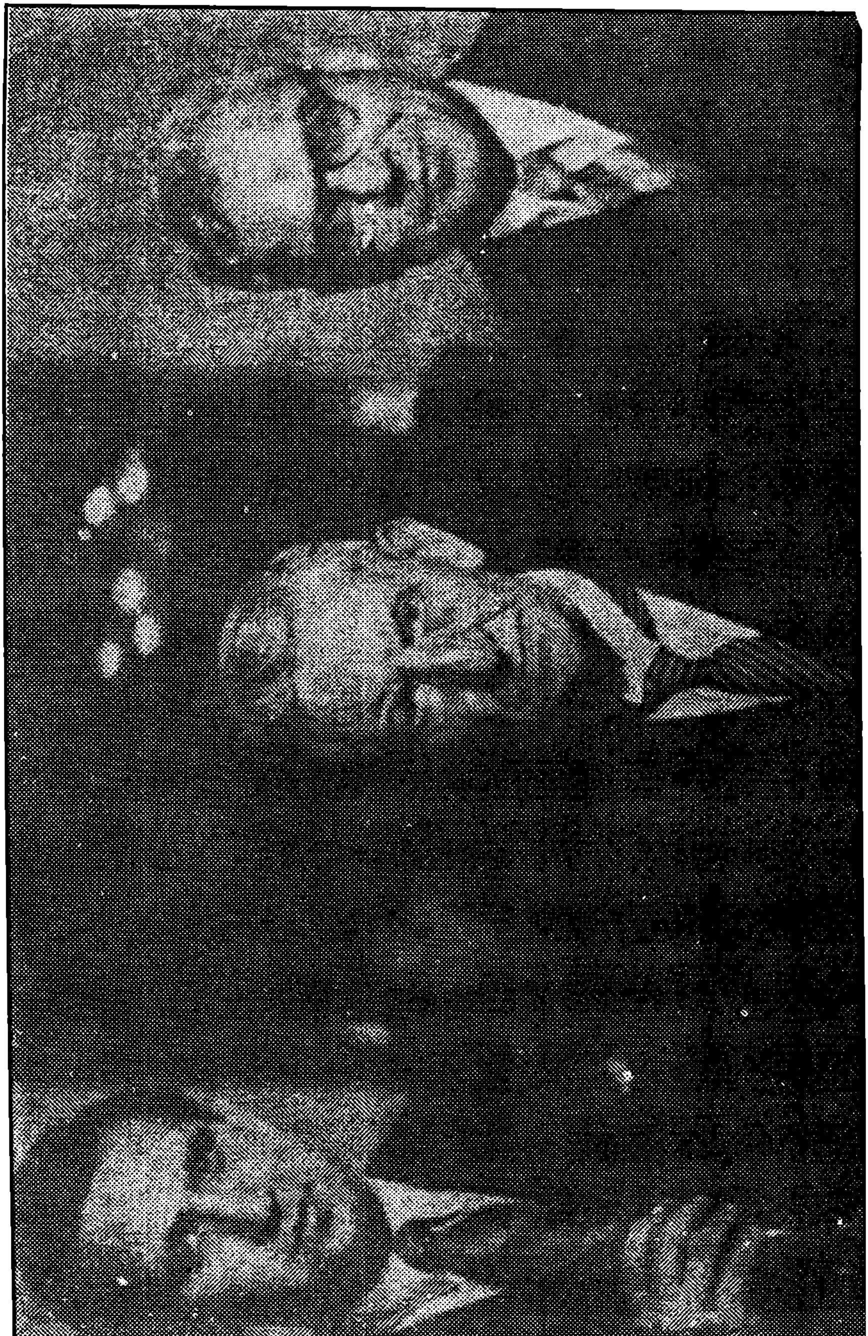

www.pathagar.com

ইংল্যান্ডের রাণী কর্তৃক কেবিই (বৃটিশ সাম্রাজ্যের নাইট কমান্ডার) উপাধীতে ভূষিত হওয়ার পর স্ত্রী ও পুত্র ও কন্যার সাথে শাপুর জী (বাকিংহাম প্রাসাদ ২০ মার্চ, ১৯৭৩)।

www.pathagar.com

রেজা খান (পরবর্তীতে রেজাশাহ) কাজাক কর্মকর্তা এবং
আর্দেশীর প্রতিষ্ঠিত গোয়েন্দা সংস্থায় কর্মরত থাকাকালে।

www.pathagar.com

দি রোজী স্কুলে রেজাশাহ পাহ্লভী (সামনের সারিতে মাঝখানে) এবং হোসেইন ফারদোস্ত (পেছনের সারিতে বামদিক থেকে প্রথম)।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আলী ফারুকী (জোকা-আল-মোল্‌ক)।

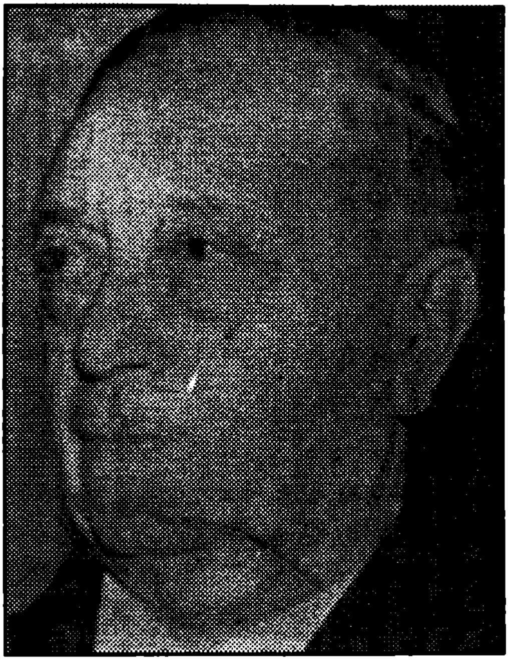

ইব্রাহীম কাভাম (কাভাম-আল-মোল্‌ক শিরাজী)।

www.pathagar.com

লেঃ জেনারেল হাজী আলী রাজমারা।

লেঃ জেনারেল ফাজলোল্লাহ জাহেদী।

www.pathagar.com

আশরাফ পাহ্লভী।

www.pathagar.com

ফাতোলাহ্ আমীর আলাই।

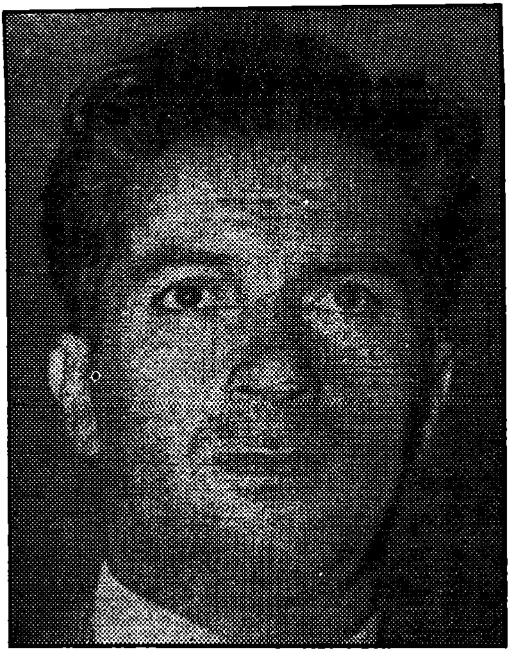

রিচার্ড হেল্‌মস্।

www.pathagar.com

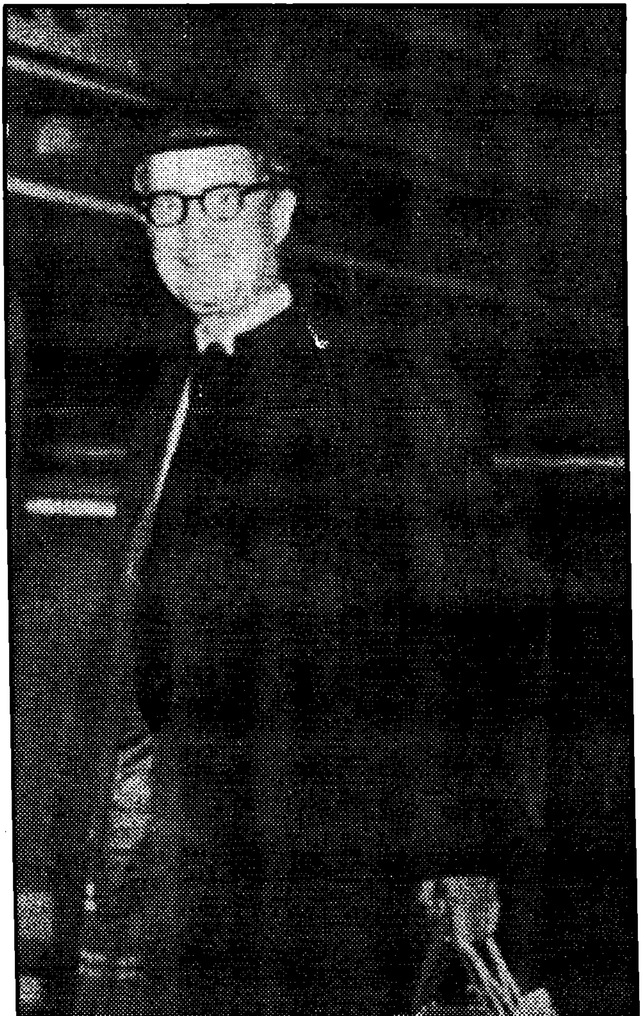

কারমিত রুজভেল্ট ।

www.pathagar.com

আমীর আসাদোল্লাহ আলম।

লেঃ জেনারেল জাহেদী, আর্দেশীর জাহেদী ও শাহনাজ পাহ্লভী।

www.pathagar.com

ডঃ আলী আমিনী।

www.pathagar.com

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদ আমিনী।

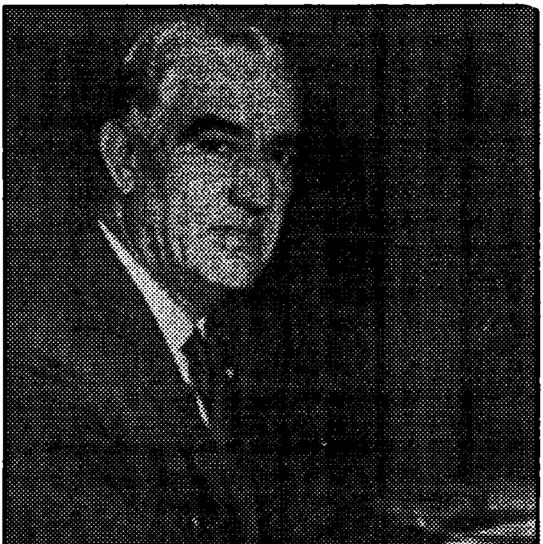

ডঃ মানুছের ইকবাল।

www.pathagar.com

জাফর শরীফ ইমামী।

জামশিদ আমৌজগার।

www.pathagar.com

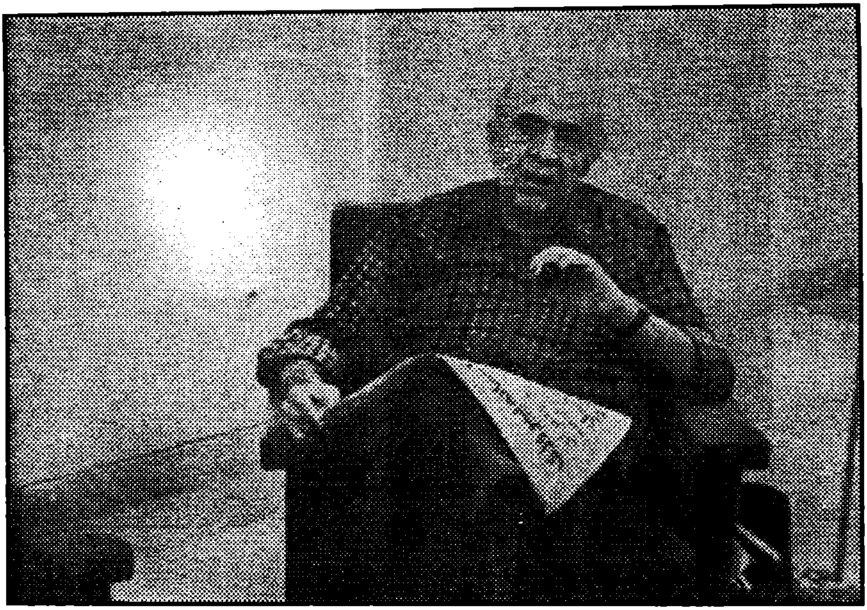

আমীর আব্বাস হোভেইদা (বিপ্লব চলাকালীন সময়ে কারাগারে)।

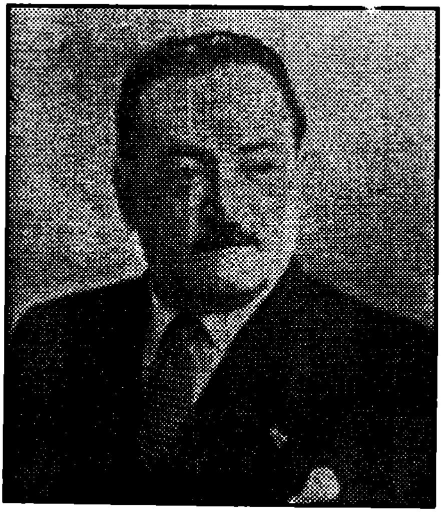

ডঃ আলেকজান্ডার আঘাইয়ান।

www.pathagar.com

জেনারেল ফারদাউস্ত ও নসরোল্লাহ মোইনিয়ান (রাজকীয় ইন্সপেক্টরেটের কার্যক্রমের ওপর টিভি রিপোর্ট)।

www.pathagar.com

জেনারেল ফেরায়দুন জ্যাম।

জেনারেল গোলাম আলী ওভেইসী।

www.pathagar.com

জেনারেল গোলাম-রেজা আজহারী।

জেনারেল আব্বাস কারাবাকী।

www.pathagar.com

আর্নেস্ট পেরন।

আজার সানিয়া (এবতেহায)।

www.pathagar.com

লিলি জাহানারা (আমীর আরজমান্দ)।

ফারুক খাজেনূরী।

www.pathagar.com

সালাহ্ উদ্দিন শোয়েব চৌধুরী সংবাদমাধ্যমের সাথে গাঁটছড়া বাঁধেন আশির দশকের গোড়ার দিকে। নব্বুইয়ের দশকের শুরুতেই তিনি রুশ বার্তা সংস্থা ইতার-তাস এর প্রধান প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। এসময়ে তিনি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর উপর ডেইলী অবজারভার, অধুনালুপ্ত বাংলাদেশ টাইমস এবং মর্নিং সান, সাপ্তাহিক হলিডে, এভিডেন্স, সংগ্রামসহ অনেক পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখেছেন। ১৯৯৬ সনে তিনি ইংরেজী দৈনিক নিউ নেশন-এর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। ১৯৯৮ সনে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল এ-২১ টেলিভিশন (পরবর্তীতে এটিভি) প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সনে সরকার এটিভি'র বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করলে সালাহ্ উদ্দিন শোয়েব চৌধুরী গ্রেফতার হন। দীর্ঘ পনের মাস কারাভোগের পর মুক্তি লাভ করে তিনি পুনরায় সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেছেন। বর্তমানে তিনি দৈনিক ইনকিলাবের বিশেষ সংবাদদাতা, সাপ্তাহিক সিটিজেন-এর উপদেষ্টা সম্পাদক ও পাক্ষিক স্পোকসম্যানের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়াও তিনি দেশ-বিদেশের অনেক পত্র-পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

সালাহ্ উদ্দিন শোয়েব চৌধুরী'র আরো কয়েকটি বই, '[illegible] ভয়াল থাবা', 'রুদ্ধ দিন বন্দী জীবন', 'দৃষ্টির [illegible]' (কাব্য গ্রন্থ) ইত্যাদি।